আর এস এস বনাম ভারত

১

আর এস এস, জাতীয় আন্দোলন
এবং
তার লাগাতার সাম্প্রদায়িক কর্মসূচী

সি পি আই (এম) প্রকাশনা

সূচীপত্র

ভূমিকা/৩
আর এস এস এর হিন্দুরাষ্ট্রের লক্ষ্য
—সাভেরা /৫
আর এস এস এবং জাতীয় আন্দোলন
— নলিনী তানেজা/১৪
জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আর এস এসের প্রতারণাপূর্ণ দাবি
—তিস্তা শীতলবাদ /২০
সঙ্ঘের রক্তাক্ত পথের শেষে
—তিস্তা শীতলবাদ /২৮
হিন্দুত্বের নামে সন্ত্রাস
– (একটি সংকলন)/৩২
" আর এস এস ছিল এক পরিবার"ঃ নাথুরাম গডসের ছোট ভাই গোপাল গড়্সে
— (একটি সাক্ষাৎকার থেকে নেয়া)/৩৫
আর এস এস'কে নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে সরকারি ঘোষণা/৩৯
(৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮)

ভূমিকা

'ভারতের বিরুদ্ধে আর এস এস'— এই শিরোনামে সি পি আই (এম) ছয়টি পুস্তিকা প্রকাশ করতে চলেছে।

এই পুস্তিকাগুলিতে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা এবং সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আর এস এস) তার প্রতিষ্ঠার সময় থেকে যে পশ্চাদমুখী ও বিভেদপন্থী ভূমিকা পালন করে এসেছে এবং এখনো করছে তার বিভিন্ন দিক পুস্তিকাগুলিতে তুলে ধরা হয়েছে।

এই পুস্তিকাগুলির মধ্যে রয়েছে— (১) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আর এস এস' এর ভূমিকা এবং স্বাধীন ভারতে তার সাম্প্রদায়িক অবস্থান। (২) আর এস এস- এর হিন্দু রাষ্ট্রের ধারণা এবং জাতি, লিঙ্গ ও আদিবাসীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি (৩) আর এস এস'র গো-মাংস নিয়ে রাজনীতি (৪) নয়া উদারবাদী আর্থিক নীতি এবং শ্রমিক শ্রেণি সম্পর্কে আর এস এস' এর উপলব্ধি (৫) আর এস এস কর্তৃক বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বিকৃতি (৬) ২০১৫ এর নভেম্বরে সি পি আই (এম) এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি এবং পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিমের যথাক্রমে রাজ্যসভা ও লোকসভায় " সংবিধান দিবস" ও "ক্রম বর্ধমান অসহিষ্ণুতা" সম্পর্কে ভাষণ।

এই পুস্তিকাসমূহের অনেকগুলিতে আর এস এস'র প্রতিষ্ঠাতাদের বিশেষত দ্বিতীয় সরসংঘচালক এম এস গোলওয়ালকর- এর লেখা থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে। আর এস এস' এর সমকালীন কার্যকলাপের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই লেখাগুলির কি প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এই পাঠ্যাংশগুলি হল আর এস এস-এর ভাবাদর্শের উৎসমুখ যা তার বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চা নির্ধারণ করে চলেছে। গোলওয়ালকরের লেখা বই 'We or our Nationhood Defined ' এবং 'A bunch of thoughts' লেখার পর হয়তো এক শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এগুলির বিষপূর্ণ ধারণা এই গোটা সময়ব্যাপী আর এস এস প্রধানগণ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন। বর্তমান আর এস এস প্রধান মোহন

ভাগবতের 'হিন্দুস্তান হিন্দুদের জন্য' বিবৃতিতেও তা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে। এতগুলি বছরের মধ্যে একটি বিবৃতিতে বা কোন লেখায় কিংবা আর এস এস' এর কোন প্রকাশনা সম্পর্কে তার রাজনৈতিক শাখা বিজেপি নিজের সামান্য দূরত্বেরও ইঙ্গিত দেয়নি, আর এস এস'এর প্রতিষ্ঠাতাদের এসব সূত্রায়ন গ্রহণ করতে অস্বীকার করা বা প্রত্যাখ্যান করার কথা তো ছেড়েই দেওয়া গেল। বিপরীতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাঁর লিখিত "জ্যোতিপুঞ্জ" নামক পুস্তকে গোলওয়ালকরের জীবনীর এক রেখাচিত্রে তাঁকে নিজের অন্যতম অনুপ্রেরণা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এই পুস্তিকাগুলিতে আর এস এস ভাবাদর্শ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত (কয়েকটি একাধিকবার) উদ্ধৃতিগুলি এই সংগঠনের প্রাণকেন্দ্রকে বোঝাপড়ার জন্য প্রাসঙ্গিক। আর এস এস হিটলারের নাজি বাহিনী এবং মুসোলিনীর 'ব্ল্যাক সার্ট' বাহিনী নামক ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলি কর্তৃক উদ্বুদ্ধ।

এই প্রশ্নও উঠতে পারে যে আর এস এস'এর এরকম মুখোশ খুলে দেওয়ার কি কোন প্রয়োজন আছে? নাকি অসাবধানতাবশত এসব তার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেবে? এই পুস্তিকাগুলির অনেকগুলোতেই দেখানো হয়েছে যে 'অন্যের' বিরুদ্ধে হিংসায় উত্তেজিত করতে আর এস এস মনুষ্য স্বভাবের সর্বনিম্ন বিভাজকের প্রতি আবেদন জানায়। এটা করতে গিয়ে সে ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগায় এবং সামাজিক ও লিঙ্গগত অসমতা নির্ভর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসকে ব্যবহার করে, যে অসমতা আজও আমাদের জনগণের এক ভালো অংশকে প্রভাবিত করে। আর এস এস যে হিন্দুত্বের কথা প্রচার করে তা ভি ভি সাভারকার উদ্ভাবিত একটি রাজনৈতিক ধারণা। সাধারণ হিন্দুত্বের বিশ্বাসীদের থেকে তা বহু দূরে। রাজনৈতিক স্বার্থে যারা ধর্মকে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদেরকে এই লড়াইয়ে মাত্রা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের নামে বিভিন্ন রঙের মৌলবাদী শক্তিগুলি ধর্মকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। যেসব মুসলীম মৌলবাদী শক্তি বিভিন্ন অংশের মুসলীম যুবকদের মধ্যে বেশি বেশি করে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে তাদের ভূমিকা গভীর উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদেরকে বিচ্ছিন্ন ও পরাস্ত করা প্রয়োজন।

এই মৌলবাদী শক্তিগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু মৌলবাদীদের দ্বারা উৎসাহিত হচ্ছে। এরা জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে বলে প্রতারণাপূর্ণ দাবি করছে। বাহ্যত প্রতীয়মান এসব পরস্পর বিরোধী শক্তিগুলি পরস্পরকে শক্তিশালী করছে এবং জনগণের মৌলিক সমস্যা থেকে তাদের মনোযোগ সরিয়ে নিচ্ছে।

কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আর এস এস শুধুমাত্র সরকারের চালিকা শক্তির কাছে অবাধে পৌঁছে যাবার অধিকারই পায়নি, যেমনটি তারা অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময়ও যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করেছিল,বস্তুত পক্ষে এরা এই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার অবস্থাতেই রয়েছে। আর এস এস নেতাদের কাছে কাজের রিপোর্ট পেশ করার জন্য যখন মন্ত্রীদের একে একে নাম ডাকা হয় তখনই পরিষ্কার হয়ে যায় কে হিসাব- নিকাশ চাইছে। সুতরাং আর এস এস- এর সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক এবং যে সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতা আজ সে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করছে তার স্বরূপ উন্মোচন করে দেওয়া প্রয়োজন।

তদুপরি আর এস এস'এর ভাবাদর্শ তার তত্ত্ব এবং চর্চার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ছিল বলেই নরেন্দ্র মোদি ছিলেন সংঘের একজন প্রচারক। একজন প্রচারকের পক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়া আর এস এস- এর কর্ম-পরিকল্পনায় এক বিরাট অগ্রবর্তী পদক্ষেপ। তাঁর নেতৃত্বে ২০০২ এর গুজরাট ছিল হিন্দুরাষ্ট্র পরিকল্পনার ফল এবং পরীক্ষা। তাকে পুরোপুরি মদত দিয়েছিল আর এস এস। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে— কে বিজেপি'কে নেতৃত্ব দেবে তা নিয়ে ২০১৩-১৪ র যখন দলে মতানৈক্য তৈরি হয় তখন আর এস এস শুধুমাত্র মোদির প্রার্থীপদকেই মদত দেয়নি এমনকি সরাসরি হস্তক্ষেপ করে এল কে আদবানি ও অন্যান্য বরিষ্ঠ নেতৃত্বের বিরোধিতাকে থামিয়ে দিয়েছিল। আর এস এস- এর মধ্যে যারা তাঁর সহকর্মী এবং বর্তমানে যারা বারংবার সাম্প্রদায়িক প্ররোচনামূলক বিবৃতি প্রচার ও কাজকর্ম করেও বিজেপি'তে ক্ষমতার বিভিন্ন পদে রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাগ্রহণ করতে অস্বীকার করাটা আর এস এস'এর প্রতি তাঁর আনুগত্যেরই প্রতিফলন। কারণ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর এস এস'ই সবার আগে।

সুতরাং প্রকৃত ঘটনা, কার্যাবলী এবং আর এস এস বাস্তবে কার প্রতিনিধিত্ব করে তার বিশ্লেষণ তুলে ধরা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় প্রকাশনা দলের পক্ষে এই প্রবন্ধগুলির রচয়িতাদের প্রতি এবং পার্টির যেসকল কমরেড ও বন্ধু এই প্রবন্ধগুচ্ছ প্রকাশের কাজে সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বৃন্দা কারাত
পলিটব্যুরো সদস্য

আর এস এস এর হিন্দুরাষ্ট্রের লক্ষ্য

সাভেরা

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি' কে যারা ভোট দিয়েছেন তারা মোটেই জানতেন না যে তারা আসলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক (আর এস এস) কেই ভোট দিয়েছেন। মোদি নিজেই তিন দশকের বেশি কাল এই সংগঠনের সর্বক্ষণের কর্মী (প্রচারক) ছিলেন। বহুসংখ্যক বিজেপি এম পি'র মত অধিকাংশ মন্ত্রীও সংঘের দীর্ঘদিনের সদস্য। আর এস এস'এর ভাবাদর্শ এবং চিন্তাধারাই প্রধানমন্ত্রী মোদি থেকে শুরু করে অধঃস্তনদের অনুপ্রাণিত করেছে। ৯০ বছর যাবত আর এস এস যেসব হিংসাশ্রয়ী কাজকর্মের প্রচার ও অনুশীলন করছে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে তা ডজন ডজন কুখ্যাত ব্যক্তিকে সারা দেশে হিংসাত্মক কাজকর্ম চালাতে উৎসাহিত করছে। আর এটাই ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে এক বিবাদ ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে, যা জনগণের ঐক্যের পক্ষে বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দেশকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। কিন্তু আর এস এস এবং তার দলবল কি চাইছে? কি প্রকারের ভারত নির্মাণের পরিকল্পনা তারা করেছে? কী ধরনের সমাজের কথা তাদের মনে-মননে? এবং কেন এটা এত বিপজ্জনক, এত আগ্নেয়?

আসুন! আমরা তা বোঝার চেষ্টা করি।

'হিন্দু' জাতি

আর এস এস'র চূড়ান্ত লক্ষ্য হল হিন্দুরাষ্ট্র (হিন্দু জাতি) নির্মাণ করা। আর এস এস'এর দীর্ঘদিনের সেবক এবং সুপ্রিমো এস এস গোলওয়ালকর 'We or our Nationhood Defined' নামক একটি বই লিখেছেন। ঐ বইতে তথাকথিত হিন্দু রাষ্ট্রের দর্শন বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মোদি একটি বই লিখেছেন। সেখানে গোলওয়ালকরকে তিনি এক বিরাট অধ্যাত্মবাদী এবং অতি শক্তিধর ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে চিত্রিত করেছেন। সমস্ত জানা বৈজ্ঞানিক প্রমাণকে অগ্রাহ্য করে বলেছেন এই "জাতি" এই ভূখন্ডে লক্ষ লক্ষ বছর" বসবাস করছে। এটা ছিল এক দানশীল, অধ্যাত্মবাদী প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব এবং স্বর্গীয় প্রাণীদের দেশ। এখন হিন্দুরা নিজেদের গুটিয়ে নেয় এবং এই মহান দেশে

"লুণ্ঠনকারীদের" আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা চলে "পরবর্তী সহস্র বছর বা আরও কম" সময়ের জন্য। এই অবস্থায় হিন্দু জনগণ শক্তি, গৌরব ও মর্যাদার দিক দিয়ে পড়ন্ত অবস্থায় পড়ে। স্পষ্টতই তথাকথিত এই পড়ন্ত অবস্থার জন্য গোলওয়ালকর মুসলীমদের দোষারূপ করেছেন। এখন কাজ হল হিন্দু জাতিকে পুনর্নির্মাণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

হিন্দুরাষ্ট্রের প্রথম সীমা নির্দেশক বৈশিষ্ট্য হল কেবলমাত্র হিন্দুরাই এর অংশ হতে পারবে।

এই রাষ্ট্র হিন্দুস্থানে হিন্দুজাতি, তার হিন্দুধর্ম, হিন্দুকৃষ্টি ও হিন্দু ভাষা (সংস্কৃতের স্বাভাবিক পরিবার ও তার বংশধরগণ) জাতি ধারণা সম্পূর্ণ করে : যা শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্থানে বিদ্যমান থাকবে এবং প্রাচীন হিন্দু জাতিকেই অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে, হিন্দু জাতি ছাড়া অন্য কেউ নয়। অন্য সকলে যারা জাতীয়তার অংশ নয়, স্বাভাবিক কারণেই প্রকৃত 'জাতীয় জীবনের' চৌহদ্দির বাইরে ছিটকে যাবে। (পৃঃ ৯৯)

গোলওয়ালকরের এই রত্নে আপনি সর্বোত্তম রঙীন, বড়জোর গুপ্ত, অন্য ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি উগ্র শত্রুতাই শুধু প্রত্যক্ষ করা শুরু করতে পারেন তা নয়, প্রত্যক্ষ করতে পারেন 'সংস্কৃতের অনুকরণ করা ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গি। হিন্দু রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত থাকবে সংস্কৃত পরিবারের ভাষায় কথা বলা মানুষেরা। যে পরিবারে থাকবে না দ্রাবিড়ীয় ভাষা পরিবার এবং অধিকাংশ উপজাতীয় ভাষা। পরবর্তীতে এটা সংঘ পরিবারভুক্ত এবং বিজেপি তার পূর্বসূরী জনসংঘের লোকজনদের হিন্দি চাপিয়ে দেবার তীব্র ধারাবাহিক লালসায় পরিণত হবে।

কিন্তু যা বেরিয়ে আসছে তা হল এই যে যারা হিন্দু নয় তারা জাতীয় জীবনের চৌহদ্দির বাইরেই থেকে যাবেন। পরবর্তীতে গোলওয়ালকর তা আরও সরাসরি উল্লেখ করেছেন:

> প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জাতি বলতে যা
> বুঝায়। যারা এই ধারণার পঞ্চপাটের সীমানার বাইরে
> থাকবেন। জাতীয় জীবনে তাদের কোন স্থানই হবে না,
> যদি না তারা তাদের পার্থক্য পরিত্যাগ করে, জাতির ধর্ম,
> কৃষ্টি ও ভাষা গ্রহণ করেন এবং নিজেদের পরিপূর্ণভাবে জাতীয়
> জীবনের অন্তর্ভুক্ত করেন। (পৃ: ১০১)

অন্যভাবে বলতে হয় যে অ-হিন্দুদের- মুসলীম, খ্রীস্টান, শিখ, জৈন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বহু উপজাতি সম্প্রদায়— অবশ্যই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে হবে, নয়তো তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে অথবা অধিকতর খারাপ অবস্থায় জীবন কাটাতে হবে। পাছে এদের সম্পর্কে কোনরকম বিভ্রান্তি দেখা দেয়, তাই গোলওয়ালকর সুস্পষ্ট ভাষায় এদেরকে 'বিদেশী

জাতি' বলে উল্লেখ করেছেন।

.... হিন্দুস্থানের বিদেশি জাতিগুলিকে হয় অবশ্যই হিন্দুকৃষ্টি সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ধর্মকে সম্মান করা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা শিখতে হবে, হিন্দুজাতি ও সংস্কৃতিকে, অর্থাৎ হিন্দুজাতিকে মহিমান্বিত করা ছাড়া অন্য ধারণা পোষণ করা যাবে না। অর্থাৎ তাদেরকে অবশ্যই তাদের পৃথক অস্তিত্ব লোপ করে হিন্দু জাতিতে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে, কিংবা হিন্দু জাতির পুরোপুরি অধীনস্ত হয়ে তারা এদেশে থাকতে পারেন, কোন কিছুর দাবি না জানিয়ে, কোন বিশেষ সুবিধা বা অধিকারের উপযুক্ত না হয়ে, পক্ষপাতমূলক কোন বিশেষ অধিকার ও নাগরিক অধিকারের তো প্রশ্নই উঠে না। (পৃ: ১০৪-৫)

১৯৩০-এর শেষ প্রহরে গোলওয়ালকর এই বই লিখছিলেন যখন এড্‌লফ হিটলারের নেতৃত্বাধীন নাজি বাহিনী জার্মানিতে ক্ষমতা দখলের চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই নাৎসিরা ইহুদিদের প্রতি যা করছিল তার ফলে গোলওয়ালকর দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তার সমর্থনের কথা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন :

সেমেটিক জাতি— ইহুদিদের হাত থেকে দেশকে বিমুক্ত করার অভিযানে জার্মানি পৃথিবীকে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দিয়েছিল। শিখরে পৌঁছানো জাতি- অহঙ্কার এখানে স্পষ্টত: প্রতীয়মান হয়েছিল। জার্মানি এটাও দেখিয়েছে কিভাবে জাতি ও সংস্কৃতিসমূহের মূলে থাকা পার্থক্যের ফলে তাদের পক্ষে এক ঐক্যবদ্ধ সমস্রোতে একাত্মীভূত হওয়া প্রায় অসম্ভব। হিন্দুস্থানে আমাদের কাছে তা একটা ভালো এবং লাভজনক শিক্ষা। (পৃ: ৮৮)

এখন আমরা মুসলীমদের সম্পর্কে আর এস এস- এর দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি বুঝতে পারছি। হয় তাদেরকে স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্মকে আলিঙ্গন অর্থাৎ গ্রহণ (ঘর ওয়াপসি) করতে হবে নয়তো পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। এ কারণেই বিজেপি নেতৃবৃন্দ যেসব মানুষ তাদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তাদের প্রতি বারংবার পাকিস্তানে চলে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। সেজন্যই ভারতে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হিংসায় উত্তেজনা সৃষ্টির যে কোন প্রচেষ্টা অবলম্বন করতেই তারা বাকি রাখছেন না। ২০০২-এ মোদি যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন সেখানে মুসলীমদের বিরুদ্ধে গণহত্যা সংগঠিত করার মত হিংসাশ্রয়ী কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও উত্তেজিত করা তারই প্রমাণ।

আর এস এস' এর দৃষ্টিভঙ্গিতে 'জাতীয়তাবাদ' এবং "স্বদেশ প্রেম' কে ততক্ষণই তারা বৈধ বলে সংজ্ঞায়িত করে যতক্ষণ তাদের লক্ষ্য হিন্দুধর্মকে মহিমান্বিত করে। অন্য কোন কাজ জাতীয়তাবিরোধী এবং এসব কাজ যারা করে তারা বিশ্বাসঘাতক। এবিষয়ে গোলওয়ালকর বলছেন ঃ

কেবলমাত্র সে সকল আন্দোলনই সত্যিকারের 'জাতীয়' আন্দোলন

যেগুলির লক্ষ্য হিন্দুজাতিকে তার বর্তমান অচৈতন্য অবস্থা থেকে মুক্ত করে। এ জাতিকে পুনঃনির্মাণ করে নব উদ্যমে সক্রিয় করে তুলবে। তারাই কেবল জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক যারা হিন্দুজাতি ও নেশনকে তাদের হৃদয়ের 'পরেই মহিমান্বিত করার উচ্চাশায় কাজে নেমে পড়ে এবং লক্ষ্য অর্জনে কঠোর সংগ্রাম করে। অন্য সকলেই হয় জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ও শত্রু, বা বদান্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, বলা যায়, জড়বুদ্ধি ব্যক্তি। (পৃ: ৯৯-১০০)

দিব্যতান্ত্রিক রাষ্ট্র

গোলওয়ালকরের চিন্তাভাবনার ব্যাখ্যা করলে যা দাঁড়ায় তা হল, সরকারি পথপ্রদর্শক নীতিসহ এক কল্পনানির্ভর দিব্যতান্ত্রিক রাষ্ট্র অর্থাৎ সনাতন ধর্ম (মূলধারার আচার- পালন সংক্রান্ত হিন্দুশাস্ত্র ও পুরান। কেমন হবে এই দিব্যতান্ত্রিক রাষ্ট্র ?

ধর্মীয় গোঁড়াপন্থীদের শাসিত কয়েকটি দেশের অতি সাম্প্রতিক কয়েকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। তালিবান শাসিত আফগানিস্তান (১৯৯২- ২০০১) ছিল একটি। সাম্প্রতিক সময়ের আরও একটি হ'ল সিরিয়ার আইসিস অধিকৃত এলাকা। ইরাক হ'ল আরেকটি। এই দেশগুলিতে নীতি নির্ধারণ ও শাসন পরিচালনার জন্য পথ প্রদর্শক নীতি ছিল ইসলামিক আইন। সৌদি আরব দেশের সঙ্গে এগুলির খুবই সাদৃশ্য রয়েছে (যেখানে নারীরা একাকী কোথাও যেতে পারেন না এবং যেখানে তারা সম্প্রতি পেয়েছেন ভোটের অধিকার। অথবা ইরানের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে দেশ কয়েকটি আধুনিক উপাদান তার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সংযোজন করে নিয়েছে। এমনকি পাকিস্তানও জেনারেল জিয়াউল হকের সময় থেকে (১৯৭৮-৮৮) শাসন পরিচালনার কাজে ইসলাম ধর্মকেই মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। দিব্যতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আরেক নীরব অনুসরণকারী হল ইজরায়েল। এই দেশটি গঠন করা হয়েছে গায়ের জোরে এবং কাজ করছে প্রাচীন ইহুদি (বা হিব্রু) নীতির ভিত্তিতে। এদেশগুলি চরম হিংসার অনুশীলন করে, শুধুমাত্র লক্ষীভূত ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নয়, রাষ্ট্রীয় ধর্ম অনুসরণকারীদের এরা প্রচণ্ডভাবে দমন করে।

এসব দিব্যতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে আরো দেখা যাচ্ছে যে একই ধর্মের অনুগামী মানুষদের মধ্যেও এরা বিভাজন ও বিবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ গঠন করে স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের হাতে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। পৃথিবীতে ঘোষিত

একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র নেপাল এক নির্মম রাজতন্ত্র কর্তৃক শাসিত হতো যে নিজের দেশবাসীর উপর অত্যাচার করতো। যার ফলস্বরূপ সেখানে দশ বছর যাবৎ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ফলে রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীব্যাপী অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত যে বিভিন্ন ধরনের মানুষকে নিয়ে ধর্ম কোন আধুনিক দেশের ভিত্তি হতে পারে না।

হয়ত বলা হতে পারে যে আমরা বড় আগ বাড়িয়ে ভাবছি যে আর এস এস ভারতে এমনই এক হিন্দু রাষ্ট্র চায়। কিন্তু ভুল করবেন না, ওরা আসলে তাই-ই চায়। এটাই গোলওয়ালকরের চিন্তাধারা, আর এস এস- বিজেপি'র পথপ্রদর্শক নীতি। একারণেই, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে আর এস এস এ'র মুখপত্র অর্গানাইজারে দাবি জানানো হয়েছিল যে সংবিধানের পরিবর্তে মনুস্মৃতিকে দেশের আইনে পরিণত করা হোক (৩০ নভেম্বর, ১৯৪৯ সংখ্যা এবং ২৫ শে জানুয়ারি, ১৯৫০ সংখ্যা)। কথিত আছে ঋষি মনু কর্তৃক মনুস্মৃতি লিখিত হয়েছে, যাতে হিন্দুনীতির অনুসারী ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের করণীয় বিধৃত রয়েছে। নারী ও দলিত মানুষের বিরুদ্ধে এতে বেদনাদায়ক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এতটাই নির্মমভাবে বলা হয়েছে যে মনুস্মৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ডঃ আম্বেদকর এর একটি কপি প্রকাশ্যে পুড়িয়ে দিয়েছেন।

গোলওয়ালকর বলেছেন যে, গণতন্ত্র হল পশ্চিমী নির্মাণ যা ভারতের পক্ষে যথাযোগ্য নয়। তিনি লিখেছেন (গুরুজী সমগ্র, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৮৯-৯৪) হিন্দু রাষ্ট্র হ'ল এমন একটি ব্যবস্থা, যা নিঃস্বার্থ ও আত্মোৎসর্গকারী এক দল মানুষ কর্তৃক পক্ষপাতশূন্যভাবে শাসিত হবে। এই আপাত সাদাসিধা দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র এক ফ্যাসিস্টসুলভ দর্শনকে আড়াল করে না, এটা যুগ- প্রাচীন বর্ণাশ্রম (চার বর্ণ) প্রথাকেও সাহায্য করার জন্য মিনতি করে, যেখানে শাসকরা ছিলেন ব্রাহ্মণ; পৌরাণিকভাবে যাদেরকে গরিব বলে ভাবা হতো কিন্তু তারা ছিলেন সবজান্তা। তারা যোদ্ধা ও বণিকদের উপর শাসন করতেন এবং অবশ্যই সমগ্র শ্রমজীবী শ্রেণির উপরও।

কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় হলো আর এস এস স্বয়ং এই ফ্যাসিস্টসুলভ পদ্ধতিতেই সংগঠিত। আর এস এস সংগঠনে নির্বাচনের কোন ব্যাপার নেই। এই সংগঠনের প্রধান বা সুপ্রীমো- সরসংঘচালক- তার পূর্ববর্তী সুপ্রীমো কর্তৃক নিযুক্ত হন। এ পর্যন্ত সকল সরসংঘচালকই ছিলেন ব্রাহ্মণ। তার নীচে রয়েছেন রাজ্য বা অঞ্চল স্তরের সুপ্রীমোগণ ইত্যাদি এবং সর্বনিম্নস্তরে শাখাপ্রমুখ। সংগঠনে আছে মিলিটারী ড্রিল, প্যারেড ও মার্চ-পাস্ট, বিশেষ স্যালুট, ইউনিফরম, তথাকথিত দেশপ্রেমিক সঙ্গীত (উগ্র ধর্মীয় সঙ্গীত), নাৎসিদের মত খাকি প্যান্ট এবং কালো টুপি।

জনগণের কি হবে?

সুতরাং হিন্দু রাষ্ট্রের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে জনগণ কিভাবে তাতে খাপ খায়? তারা কি করবে, কিভাবে তারা বাঁচবে, জীবনের উদ্দেশ্য কি? গোলওয়ালকর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই অনুসারে আর এস এস- এর কথা হল ধর্মীয় অস্তিত্ব নির্বাহ করে অন্তিমে মোক্ষ লাভ করা (অস্তিত্বের চক্র বিমুক্ত, শাশ্বত স্বর্গসুখ)। পার্থিব আনন্দ ও সামগ্রীর তিনি খোলাখুলি ও ব্যাপকভাবে নিন্দা করেছেন। তিনি সেগুলিকে অবশ্যম্ভাবী ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করে বলেছেন কেউ যেন সেগুলিতে আবিষ্ট বা আচ্ছন্ন না হন। চরম দারিদ্র, বেকারি, রোগশোক অজ্ঞতা এবং যাবতীয় অত্যাচার ইত্যাদির বন্ধন ছুঁড়ে ফেলতে সাধারণ মানুষের যেকোন দাবি ও আশা আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সতর্ক করবে এই অবস্থান।

হিন্দুরাষ্ট্র যে অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ত্রুটিপূর্ণ ও শিশুসুলভ। ভারী শিল্পের বিরুদ্ধে গোলওয়ালকর বিদ্রুপ করেছেন (খন্ড ৯, পৃ: ৫৯) এবং চেয়েছেন গ্রামগুলি যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠে (খন্ড ৫, পৃ: ১৩-১৪)। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তিনি গোবর ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছেন (খন্ড ৫, পৃ: ৬৫-৬৮)। দারিদ্র সম্পর্কে সাধারণ অশ্রু বিসর্জন করেছেন এবং দারিদ্র দূর করার জন্য যারা কেবল স্লোগান তোলেন তাদের সমালোচনা করেছেন। তারপর অবিশ্বাস্য রকম এক সাদাসিধা বা প্রতারণাপূর্ণভাব জাহির করে তিনি সুপারিশ করেছেন দারিদ্র দূরীকরণের জন্য প্রত্যেক হিন্দুর উচিত প্রতিদিন এক মুষ্টি শস্য গরিব ও ক্ষুধার্তের জন্য সরিয়ে রাখা (খন্ড ৫, পৃ: ৯২)!

কিন্তু সমাধান কি? তিনি লিখেছেন (খন্ড ৫, পৃ: ২৬৩-২৬৫) দারিদ্র নির্মূল করার একমাত্র পথ হল জনগণের স্বার্থপর হওয়া বন্ধ করতে হবে এবং অধিকতর সততার সাথে কঠোর পরিশ্রম করা শুরু করতে হবে যাতে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায়। এই হল মহান হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি এবং সমগ্র পৃথিবীর কাছে তা হবে আশার এক আলোক সঙ্কেত। এর অর্থ হল বিশাল শ্রমজীবী জনগণকে 'জাতির' জন্য অন্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে। অধিকতর মজুরি এবং সুযোগ সুবিধা না পাওয়ার কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত না হয়ে শুধু মাত্র বেঁচে থাকার মত যথেষ্ট মজুরি পেয়েই তাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তারা অতিরিক্ত যে সম্পদ সৃষ্টি, করবেন তা চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে।

জমি ও যন্ত্রপাতি এবং মূলধনের মত উৎপাদনের বিপুল উপকরণ যেসব পুঁজিপতি ও জমিদারগণ একচেটিয়াভাবে ভোগ করছেন তাদের ব্যাপারে কি হবে? গোলওয়ালকর সঙ্কেত দিয়েছেন 'হৃদয়ের পরিবর্তনই' তাদের কাছে প্রত্যাশিত যাতে তারা সম্পদ সংগ্রহ বন্ধ করে তা জনগণের সঙ্গে ভাগ করে নেন (খন্ড ২, পৃ: ১০০-১০১)! এটা গান্ধীবাদী সমাধান, যা পুঁজিবাদ ও শোষণের পক্ষে কৈফিয়ৎদানকারীদের কাছে খুবই প্রিয়। গোওয়ালকর এটিকে

বলছেন ভারতীয় সমাধান; বস্তুতঃ পক্ষে এটা না ভারতীয়, না কঠোর শ্রেণিশোষণের বিরুদ্ধে কোন সমাধান, যা সকল মানবগোষ্ঠীর বিশুদ্ধতা নির্দেশক।

তীব্র শোষণের বিরুদ্ধে জমিদার ও শিল্পপতিদের ভান্ডারপূর্ণ করার জন্য ভারতে কোটি কোটি মানুষ যে শ্রম করেন সে সম্পর্কে কষ্টকল্পিত কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টা অর্থনৈতিক বাস্তবতা, এর দোষ ত্রুটিকে আড়াল করার এক হাস্যকর প্রচেষ্টা বলে মনে হয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের মহত্ব সম্পর্কে আর এস এসের অন্যান্য দৃঢ় ঘোষণাবলী হিন্দু রাষ্ট্রের আসল বিষয়টা উদঘাটন করে দেয়। মানুষকে ধর্মীয় গোঁড়ামির কানাগলিতে তাড়িয়ে নেওয়া এবং তাদেরকে বোকা বানানোর এটা নিছক একটা ষড়যন্ত্র মাত্র।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে সম্ভ্রান্তগণ যারা জমি ও শিল্পের মালিক, উচ্চ জাতিভুক্ত ব্যক্তি এবং তাদের পরিচারক ও পরিচারিকারা যাতে আনন্দফুর্তি করতে পারে এবং এই সাধু জনসমষ্টির মুনাফার সুবিধা ভোগ করতে পারে সেজন্য সারাক্ষণই ফ্যাসিবাদী সুলভ নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন করা হবে।

আর এস এস কি সফল হবে?

অবৈজ্ঞানিক ও মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার মূলে নিহিত এই আতঙ্কজনক আদর্শকে যদি তার স্বরূপে ভারতের জনগণের সামনে উপস্থাপিত করা হয় তাহলে তা সর্বতোভাবে বাতিল করা হবে। কয়েক যুগ আগে পায়ের গোড়ালি ভালো করে আচ্ছাদিত এক দল উঁচুজাতি মানুষ নাগপুরে যা ভেবেছিল পৃথিবী ও ভারত তা থেকে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ভারতের জনগণ চিরকালের দেখা অন্যতম অতি শক্তিশালী উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করে ওদেরকে বিতাড়িত করেছেন। এই লড়াইয়ে পথ সংক্ষেপের অপথে হেঁটে তারা ধর্ম, জাতি, ভাষাভিত্তিক জাতি ও ভাষাগত বিভাজন সরিয়ে রেখে এক অভূতপূর্ব ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন। এটা সত্য যে, যুক্তি এবং ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন আজও বাস্তবায়িত করা যায়নি। কারণ স্বাধীন ভারতের শাসকশ্রেণিগুলি জনগণের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জনগণ তাদের দৈনন্দিন জীবন ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জানেন যে ধর্ম কখনো জনগণের যৌথ মুক্তির পথ হতে পারে না। যদি তাই-ই হত তাহলে কোন হিন্দু শ্রমিককে তার হিন্দু নিয়োগ কর্তার হাতে পাশবিক শোষণ ও অপমানকর জীবনযাপন করতে হত না, কোন দলিতকে হিন্দু জমিদার কর্তৃক ধর্ষিতা বা খুন হতে হত না।

কিন্তু আমাদেরকে আর এস এস ও তার দলবলের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের পরাস্ত এবং তাদের বিস্তার ঘটানো বন্ধ করতে হবে। কারণ তাদের লক্ষ্য অর্জনের অভিযানে আর এস

এস এবং বিজেপি'র মত তাদের ফ্রন্ট ভারতের রক্ত ঝরাবে, বিভেদমূলক ঘৃণা ও বিষ ছড়াবে এবং জনগণের ঐক্য বিনষ্ট করবে। বিজেপি'র ক্ষমতায় আসার ফলে এই অভিযান গতিলাভ করেছে। সমাজের গভীরে প্রবেশ করার জন্য একে এরা জনাদেশ- হিসেবেই মনে করছে, সমাজে সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার এবং যে কোন প্রকারে তাদের শাসনের বিস্তৃতি ঘটানোর পক্ষে অনুকুল অবস্থা হিসেবেই দেখছে।

আর এস এস এবং জাতীয় আন্দোলন

নলিনী তানেজা

মহাত্মা গান্ধীর হত্যার পর দেশজুড়ে জনপ্রিয় রোষ এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারির পরিপ্রেক্ষিতে আর এস এস কর্তৃক উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং সম্ভবত: ভাবমূর্তি এবং বিশ্বাসযোগ্যতা কিছুটা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে আর এস এস ঘোষণা করতে বাধ্য হয় যে সে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়। সে একটি সামাজিক- সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এটা প্রধানত: একটি সামাজিক- সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যার রয়েছে অনেকগুলো অনুমোদিত রাজনৈতিক শাখা। তার প্রতিদিনকার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ছিল তার ভিত্তি, তার হিন্দু রাষ্ট্রের ফ্যাসিস্ট কর্মসূচীর ভিত্তিমূলক উপাদান।

হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আর এস এস'এর কাছে স্বাধীনতা সংগ্রাম অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যে কারণে ১৯২৫ সালে আর এস এস প্রতিষ্ঠার সঙ্গে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যাবতীয় প্রচেষ্টাকে এক দৃঢ় সাংগঠনিক রূপ দেওয়া হয়েছিল। এই হিন্দু রাষ্ট্রের মূল কথা হল সমস্ত দিক থেকে এক ব্রাহ্মণ্য সমাজের নেতৃত্ব।

উচ্চ জাতিভুক্তদের নেতৃত্বে পুরোপুরি বাছাই করা অংশকে সামরিক শাসনে অনুপ্রাণিত জাতির সমশ্রেণিভুক্তদের স্বাধীনতার আগেই প্রস্তুত করা হয়েছিল। আজকের ধর্ম, উৎসব, শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান, গরু সম্পর্কে ঘৃণার পরিপূর্ণ প্রচার, জনসংখ্যা, ধর্মান্তরণ, মন্দির, খাবার ইতিহাসের ধর্মনিরপেক্ষ বোঝাপড়া ইত্যাদি হিন্দু সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের সহজলভ্য প্রচার প্রস্তুতি গোটা জাতীয়তাবাদী তীব্র আন্দোলন পর্বের অংশ। আর এস এস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ) এর জন্ম হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর ইউরোপে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের যুগে এবং সোভিয়েতে বিজয়ী সমাজতন্ত্রের যুগে— যে সোভিয়েত ইউনিয়ন হ'ল বৈপ্লবিক, উপনিবেশবাদ বিরোধী যুদ্ধের উর্বর জমি এবং কর্তৃত্ববাদী ফ্যাসিস্ত আন্দোলনেরও উর্বরা ভূমি।

১৯১৭ সালের রাশিয়ার বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। ভগৎ সিং ও তাঁর কমরেডরা এবং সকল প্রগতিশীল, সমাজতন্ত্রী এবং দেশের কমিউনিস্ট গ্রুপগুলি ও বিভিন্ন গ্রুপ কর্তৃক দারুণভাবে উদ্দীপিত। বৈপ্লবিক জাতিয়তাবাদ ও বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপের সৃষ্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের মধ্যে যার পরিণতি ঘটেছিল। এসব ছিল এই প্রক্রিয়ারই অংশ। আর এস এস বিপরীতপন্থীদেরই প্রতিনিধিত্ব করতো। ইতালিও জার্মানির

ফ্যাসিবাদী শক্তির কাছ থেকে এটি অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। সঙ্গে ছিল তাদের কর্তৃত্বপূর্ণ, জাতিগতভাবে শ্রেষ্টত্বের দাবি তাদের প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচীর যথার্থতা প্রতিপন্ন করার জন্য ' সোনালী অতীতের ধারনা এবং মনের আবিষ্ট অবস্থাসক্ত বহু বিখ্যাত আর্য জাতি- সম্পর্কিত পরিচয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ঊনবিংশ শতকের ভারতের পুনরুজ্জীবনবাদী চিন্তা এবং ভারতীয় ইতিহাস ও সমাজের উপনিবেশবাদী উপলব্ধি। আর এস এস এমন এক দর্শনের উন্নতি ঘটিয়েছিল যা বামপন্থী গোষ্ঠী এবং ফুলে, পেরিয়ার ও আম্বেদকরের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত, আর এস এস'র দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তার দর্শনে শ্রমজীবী মানুষ এবং নিপীড়িতদের জন্য কিছুই ছিল না। জাতি-বিরোধী আন্দোলনের উত্থান মোকাবিলা করার ঘোষিত উদ্দেশ্যে এবং বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে এবং বর্তমান ভাবাদর্শের সমর্থনে (বর্ণাশ্রম ধর্ম, জাতি প্রথা) আর এস এস'এর জন্ম হয়েছিল।

১৯২০ ও ১৯৩০ এর দশক ছিল উপনিবেশবাদ বিরোধী তীব্র গণআন্দোলনের দশক। সেই গণআন্দোলনের প্রথম জাতিভিত্তিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল অসহযোগ আন্দোলনে। হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন (১৯২৪ সালে গঠিত) ও তার ইশ্‌তেহার 'বিপ্লবী' তে ১৯২৫ সালে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বিপ্লবের প্রতি এবং আর এস এস ও হিন্দু মহাসভার প্রতি ঘোষিত হয়েছিল প্রতিশ্রুতি।

বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্রে যেখানে প্রত্যেককে সমান নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করা হত, আর এস এস এবং তার সভ্যগণ হিন্দুস্থান বা ব্যতিক্রমী হিন্দুরাষ্ট্রের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। যে রাষ্ট্র মনুস্মৃতিতে প্রতিফলিত পীড়নমূলক জাতিপ্রথার আদর্শকে ধরে রাখবে ঃ

হিন্দুস্থানে বিদেশি জাতিগুলিকে হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষাকে মেনে নিতে হবে, অবশ্যই হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শিখতে হবে, হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে আর কোন আদর্শকে তারা মেনে নিতে পারবেন না, অর্থাৎ হিন্দু জাতির এবং নিজেদের পৃথক অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়ে হিন্দু জাতিতে মিশে যেতে হবে। তাদের বিশেষ গুরুত্ব বা নাগরিক হিসেবে অধিকার তো দূরের কথা হিন্দুজাতির পুরোপুরি অধীন হবে, কোন কিছু না চেয়ে, কোন কিছুর যোগ্য না হয়ে তারা এদেশে থাকতে পারেন। তাদের পক্ষে অন্য পন্থা অবলম্বনের কোন সুযোগ নেই, অন্তত পক্ষে সুযোগ থাকা উচিত নয়। আমরা প্রাচীন জাতি, বসবাসের জন্য আমাদের দেশকে বেছে নিয়েছে এমন বিদেশি জাতির সঙ্গে আমাদের এমন আচরণই করা উচিত একটি প্রাচীন জাতির যা করা উচিত (We or Our Nationhood Defined)।

প্রতিদিনকার সামাজিক জীবনে এটা এক কলহপূর্ণ ও গোঁড়ামিপূর্ণ ইস্যু। গোরক্ষা সমিতির বিস্তৃতি ঘটেছিল, ঘটেছিল এর পবিত্রতার এক সংগ্রামশীল নিশ্চয়কর পরিণতি। গো-হত্যার বিরুদ্ধে এসব আগ্রাসী অভিযান মুসলীমদের বিরুদ্ধে ঘৃণার অভিযানে পর্যবসিত

হয়েছিল। ব্রিটিশ আদমশুমারী নির্ভর ধর্মান্তরণ বিরোধী প্রচার যাতে ধর্মের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তি করণ রেকর্ড করা হয়েছিল তা শুদ্ধিকরণ অভিযানে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং নিজ দেশে হিন্দুদের সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়ার মতো মস্তিস্ক বিকৃতির সৃষ্টি হয়েছিল অনেকটা আজকের ঘর ওয়াপসি'র মতো। নামাজের সময় মসজিদের সামনে উগ্র ধর্মীয় সঙ্গীতের রেকর্ড বাজানো, মসজিদের সামনে সুপরিচিত মৃত শূকরের মৃতদেহ এবং মন্দিরে গরুর মৃতদেহ ফেলা প্রাক-স্বাধীনতা যুগের কৌশলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। হিন্দু 'স্বর্ণ যুগ' এবং মোঘলদের সময় মুসলীম অত্যাচার ধর্মান্তরণে বাধ্য করেছিল। বিদেশি শাসনের (এমনকি কালক্রমের প্রতি কোন সম্মান না দেখিয়ে) বিরুদ্ধে 'হিন্দু শহীদদের হাজার বছরের পুরানো সংগ্রামের বীরগাথা, ইতিহাসের পরিচিতি, জাতি এবং সব কিছুই হিন্দুধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত যাকে ইতোমধ্যেই আধুনিক হিন্দুত্বের আকার প্রদান করা হচ্ছিল, সব বিষয়বস্তুই নিয়মিত এবং রোটিন মেনে তাদের প্রকাশনায় স্থান পাচ্ছিল : ১৯২০- এর দশকে স্থাপিত হয়েছিল গীতা প্রেস, হিন্দুপঞ্চ ছিল এক গন্ধকপূর্ণ সাময়িকপত্র এবং প্রচারপত্র এবং পাবলিক মিটিং প্রচুর সংখ্যায় অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ১৯৪০ সাল নাগাদ আরো একগাদা সাময়িকপত্র বেরিয়েছিল। এবং ১৯৪০- এর শেষ নাগাদ তাদের কর্মী দলের বাইরে স্বীকৃত পাঠকসহ একাধিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দী-হিন্দু- হিন্দুস্থান এর অনুসিদ্ধান্ত অনুযায়ী সৃষ্টি হয়েছিল উর্দু- মুসলিম - পাকিস্তান। তারা তাদের মহিলাদের জন্য গঠন করেছিল রাষ্ট্রীয় সেবিকা সমিতি এবং তাদের বিভিন্ন ফ্রন্টের ছাত্র ও যুবকদের জন্য এবং পৃথক জাতীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার পৃথক ফ্রন্ট। জাতিপ্রথা রক্ষার জন্য তারা ছিল খুবই মারমুখী, হিন্দু ঐক্য গঠন করে লাভ ওঠাতেও বিমুখ ছিলনা। হিন্দু ঐক্য গঠন ও রক্ষার ক্ষেত্রে তারা কংগ্রেসকে বেদের ঘোষণা অনুযায়ী অক্ষম হিসেবেই বিবেচনা করেছিল। বিজ্ঞান থেকে সংস্কৃতি সবকিছুর মধ্যে 'ভারত প্রথম' বলে কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল, দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তারা ব্রিটিশদের প্রতি ক্রীতদাস তুল্যই থেকে গেছিলঃ প্রকৃতপক্ষে তারা ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে পুরোপুরি উপনিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ও সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছিল, যেমনটি তারা আজও করে চলেছে। মুসলিমরা আজকের মত আগেও শত্রু বলেই পরিগণিত হত। যদিও তারা ব্যাপক সংখ্যায় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন; আর এস এস ও হিন্দু মহাসভার কর্মীদের বিপ্রতীতে। ইতিহাসরচনায় লক্ষ লক্ষ মুসলিমের ব্যাপক সংখ্যায় ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সংগ্রাম, অসহযোগ আন্দোলন, গণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ, কারাবরণ এবং শহীদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, ১৯১৫ সালের সিঙ্গাপুর বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী পঞ্চদশ লাইট ইন্‌ফ্যান্ট্রিভুক্ত মুসলিম সিপাহীগণ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে গদর আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সিপাহীদের পর সবচেয়ে বড় বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী হিসেবে খ্যাত এবং তাঁদের মধ্যে ৪৯ জনকে সরাসরি বন্দুকের

গুলিতে শহীদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, আসফাকুল্লা খান, হসরৎ মোহানী, খান আব্দুল গফফর খান, আসফ আলী, সইফুদ্দিন কিস্‌লু, বদরুদ্দিন তায়াবজি, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ কয়েকটি পারিবারিক নাম।

আর এস এস কর্তৃক জাতীয়তাবিরোধী হিসাবে খ্যাত কমিউনিস্টগণ কেবল দৃষ্টান্তমূলক স্বাধীনতা সংগ্রামীই ছিলেন না, তাঁরা কিন্তু শ্রমিক, কৃষক, যুবকদেরকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও সংগঠিত করেছিলেন যাঁরা ভারতীয় শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে এঁদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামেও অনুপ্রাণিত করেছিলেন। উল্লেখ্য যে ভারতীয় শাসকশ্রেণিভুক্তরা এঁদের উপর চরম নির্যাতন অত্যাচারও চালিয়েছিল। সংখ্যায় এঁরা কয়েক হাজার। বস্তুত: পক্ষে দু'জন কমিউনিস্ট — মৌলানা হসরত সাহানী এবং স্বামী কুমারানন্দ- সর্বপ্রথম ১৯২১ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৯২২ সালের আহমেদাবাদ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বেই তেভাগা এবং তেলেঙ্গনা আন্দোলন এবং ওরলিতে আদিবাসী বিদ্রোহ ঘটেছিল। অনভিজ্ঞ কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশদের তীব্র আন্দোলনের মুখোমুখি হয়েছিল। ১৯২০- এর দশকে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের উপর একাধিক মামলা চাপানো হয়েছিল। তাদের কারাবাস হয়েছিল। পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। যে মামলায় মুজফ্‌ফর আহমদের যাবজ্জীবন সাজা হয়েছিল, এবং কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁদের সাজা হয়েছিল। আর এস এস ও হিন্দু মহাসভার নেতারা কি করছিলেন? বিনায়ক দামোদর সাভারকার, যাঁকে বিদ্যা ভারতীর মূল পাঠ্য পুস্তক ও লোকাচার পুস্তকে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছিল তিনি ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমা পর্যন্ত চেয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে সহযোগী হিসাবে কাজও করেছিলেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে (১৮৫৭ সাল সম্পর্কিত তাঁর পুস্তকে) তিনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দকে হিন্দু- মুসলিমকে বাস্তব কারণে একসঙ্গে কাছাকাছি আসার প্রথম ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি পরিচ্ছন্ন ও দ্বিধাহীন ভাষায় স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নেন এবং এই দূরত্বের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণাও করেন। ভবিষ্যতে সদ্ আচরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আন্দামান জেল থেকে নিজের মুক্তি নিশ্চিত করেন। এই দ্বিতীয় আবেদনের পুরো বয়ান আর সি মজুমদারের আন্দামান বন্দীদের ফৌজদারী দণ্ড সংক্রান্ত চুক্তিনামাতে এবং ফ্রন্টলাইন পত্রিকার (এপ্রিল ৭, ১৯৯৫, পৃ: ৯৪) হস্তলিপির মুদ্রা ছবিতে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯২৪ সালের মধ্যে তার বই 'হিন্দুত্বে' তিনি হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন যেখানে তিনি বিশাল মুসলীম সম্প্রদায়কে শত্রু হিসাবে উল্লেখ করেছেন সকল রাজনীতির হিন্দুত্বকরণের ডাক দিয়েছেন এবং হিন্দু জাতিকে সামরিক আদর্শে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন এবং যথানিয়মে গণআন্দোলন বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করতে

গিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও অবস্থান গ্রহণ করেছেন যখন কংগ্রেস ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করছিল। হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্যে সভাপতির ভাষণে তিনি গর্বের সঙ্গে দ্বি-জাতি তত্ত্বের সপক্ষেই বলেছেন। স্বাধীনতার পর তার ভূমিকা ছিল গান্ধী হত্যারই অনুকুলে ; শুধুমাত্র প্রমাণের অভাবে এই অভিযোগ থেকে তিনি মুক্তি পেয়ে গেছিলেন। প্রসঙ্গত, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় বাজপেয়ীর বিরুদ্ধেও ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করার নজির রয়েছে। কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর গ্রেপ্তারের ঘটনায় তার রাজসাক্ষী হওয়ার ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য (মালিনী চ্যাটার্জী, ভি কে রামচন্দ্রন (খন্ড ১৫, নং-৩, ফেব্রুয়ারি ৭-২০, ১৯৯৮)।

তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় আর এস এস- এর হস্তক্ষেপের প্রধান ধরণ ছিল দাঙ্গায় উস্কানি প্রদান করা এবং দাঙ্গা সংগঠিত করা, জাতীয়তাবাদী শ্লোগানের মত উচ্চতায় দ্বি-জাতি তত্ত্বের স্লোগানকে পৌঁছে দেওয়া, সংগঠনের অভ্যন্তরে শত্রুর বিদ্যমানতার কারণে দ্বি-জাতি তত্ত্বের সঙ্গে ঐকমত্য ঘোষণা করা।

আর এস এস ও হিন্দুমহাসভার নাসিক- নাগপুর অঞ্চলে বোনশালা সামরিক স্কুল প্রতিষ্ঠার (১৯৩৭) বিষয় নিয়ে হিন্দু কর্মীদের প্রশিক্ষণের ঘোষিত লক্ষ্যে এবং হিন্দু কর্মীদের ব্রিটিশ সেনা বাহিনীতে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যেঃ যাতে তারা রাজন্য শাসিত দেশীয় রাজ্যগুলির অধিগ্রহণ/ বা তাদের সৈন্য দলের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে তারা তাদের কর্মীদের নাৎসি/ ফ্যাসীবাদী সংঠনের আদলে সংগঠিত করার চেষ্টা করতো। গোলওয়ালকারের We or Our Nationhood Defined এবং Bunch of Thoughts নামক বইগুলি হিটলার ও মুসোলিনির ভাবধারায় উদ্দীপিত হওয়ার অনুপ্রেরণা নিয়েই পাঠ করা হতো। জার্মানি ও ইতালিতে এই দুই সংস্থার সঙ্গেই বাস্তবে ওরা সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। রাজন্য শাসিত রাজ্যগুলিতে সবচেয়ে জঘন্য মুসলিম হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল। আর এস এস এবং মহাসভা ক্যাডারদের ভূমিকা অনেকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত (এর মধ্যে কয়েকটি নাম হ'ল হায়দ্রাবাদ, জম্মু, আলোয়ার- ভরতপুর- মেওয়াট ও পাতিয়ালা—। এমনকি দেশ বিভাগের আগে দিল্লিতে এই সংগঠনগুলির দৃঢ় ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। ১৯৪৭ সালে ব্যাপক আকারে উদ্বাস্তু আগমনের সময়ও এদের কর্মীরা বা ক্যাডারগণ যন্ত্রের মত মুসলিম জনগণকে হত্যা করেছে এবং খুনের জন্য হাজার হাজার মুসলিম জনগণের পিছু নিয়ে খুঁজে বের করেছে, যদিও এসব মুসলিম জনগণ পাকিস্তানে চলে যাওয়ার জন্য মোটেই উৎসুক ছিল না। মুসলিম জনগণকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ, দাঙ্গা হাঙ্গামা, দিল্লি ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে পুলিশ, প্রশাসনিক অফিসারদের সব কিছু দেখেও না দেখার ভান করার ঘটনা অনেক বইতে বিশদে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলা এবং পাঞ্জাবেও তাদের ভূমিকা

ছিল একই ধরনের। ঐ সময়ের কমিউনিস্ট পার্টির দলিলগুলিসহ (ধন্বন্তরি ও পি সি যোশী রিপোর্ট) পাঞ্জাবে আর এস এস-র কার্যকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। জনপ্রিয় আন্দোলনের তীব্রতা এবং ইনকিলাব্—জিন্দাবাদ ধ্বনি; তেভাগা, তেলেঙ্গানা ওরলি, রিচ বিদ্রোহ, করাচিতে নাবিকদের প্রতিবাদ, পুন্নাপ্রা-ভায়ালার থেকে শুরু করে আই এন এ'র বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের পর দেশভাগজনিত দাঙ্গা হাঙ্গামা। ততদিনে মুসলিমও গ্রাহ্য করার মত শক্তিতে পরিণত হয়ে উঠেছে, স্বাধীনতার অব্যবহিত আগের সময়ের রাজনীতির অন্যতম উপাদান, যে উপাদান পাকিস্তান দাবিতে পর্যবসিত হয়েছিল।

আর এস এস' এর পক্ষে ১৯৪৬ -৫১ বছরগুলি ছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণার অভিযান চালানার সময়, দেশ বিভাজনের দায় চাপানোর সময় এবং গান্ধী, আম্বেদকর, নেহরু এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তীব্র বিষপূর্ণ প্রচার চালানোর সময়। ১৯৫১ সনে জনসংঘ গঠনের সময় আর এস এস ইতোমধ্যেই তার রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে নিয়েছে, গান্ধী হত্যার পর কংগ্রেসের পক্ষে বিরাট জনসমর্থনের ফলে সৃষ্ট অস্বস্তির কারণে শুধু নয়, স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্টরা দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে।

বিংশ শতাব্দী জুড়ে, দক্ষিণ এশিয়া বিভিন্ন ধরনের মৌলবাদ প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু হিন্দুরাষ্ট্র সৃষ্টি প্রচারাভিযানের সঙ্গে আকার ও লক্ষ্যের দিক থেকে ঐসব কিছুরই কোন সাদৃশ্য নেই। তাদের (আর এস এস'র) অখন্ড ভারত বস্তুতঃপক্ষে খন্ডিত ভারতই ঃ স্বাধীনতা এবং নতুন ভারতের অভিজ্ঞতা অবশ্যই আরো তৃপ্তিদায়ক হ'তো যদি আর এস এস ও তার সদস্য বা অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলির শক্তি যে ভাবধারা তারা আমাদের সামাজিক পরিবেশে বহন করে এনেছিল সেই শক্তি যদি তাদের না থাকতো।

তার সমগ্র ইতিহাসব্যাপী আর এস এস'র ভূমিকা সাম্প্রদায়িক বিভেদসৃষ্টিকর। ভারত যখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছিল, আর এস এস ও তার বিভিন্ন সংগঠন তখন ধর্মের নামে কাজ করেছে জনগণের ঐক্য ধ্বংস করার জন্য।

অন্যভাবে বলতে হয় আর এস এস দাঁড়িয়েছিল ভারতের বিরুদ্ধে।

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আর এস এসের প্রতারণাপূর্ণ দাবি

তিস্তা শীতলবাদ

ভারতীয় সংবিধানের ১৪নং ধারার বলা হয়েছে ঃ " রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে আইনের সামনে সমান সুযোগ প্রদানের বিষয় অস্বীকার করবে না, কিংবা ভারতীয় ইউনিয়নের অভ্যন্তরে কোথাও কোনো ব্যক্তিকে সমান সংরক্ষণের সুযোগ অস্বীকার করবে না।"

কিন্তু আর এস এস'র ভাবাদর্শের মুখ্য ব্যাখ্যতা এম এস গোলওয়ালকার তার We or Our Nationhood Defined গ্রন্থে (১৯৩৮) লিখছেন ঃ অহিন্দুদের হিন্দুস্থানে অবশ্যই হিন্দুধর্মকে গ্রহণ করতে হবে.... কিংবা তারা এদেশে থেকে যেতে পারবে হিন্দু জাতির সম্পূর্ণ অধীনস্ত হয়ে, কোনো কিছুর দাবি না করে। কোনো সুযোগ সুবিধার জন্য যোগ্য বিবেচিত না হয়ে, কোনো সুযোগ সুবিধার জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থার তো প্রশ্নই উঠে না, এমন কি নাগরিক অধিকারও না।" এই গ্রন্থটি আর এস এস' এর সদস্য ও অনুগামীদের কাছে মতাদর্শগত উৎসমুখ।

আমাদের সংবিধানে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র হিসাবে ভারতের এই ধারণার বিকৃতি এবং দেশকে একটি দিব্যতান্ত্রিক সর্বোৎকৃষ্ট রাষ্ট্ররূপে জোর করে টেনে নামানোর চেষ্টা আজ ভারতকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। এই গুরুতর ভীতি প্রদর্শনের ঘটনার মোকাবিলা করার জন্য আর এস এস কি, তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে এবং এর ইতিহাস কি ছিল তা আমাদের বুঝতে হবে।

ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) শুধু আর এস এস'র রাজনৈতিক শাখা। এর অধিকাংশ নেতা যারা এখন প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য সাংবিধানিক পদে বৃত রয়েছেন তারা আর এস এস'র প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন। আর এস এস যদিও সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে নিজেকে দৃঢ়ভাবে জাহির করে, প্রকৃতপক্ষে এই সংগঠন হিন্দু জাতির' পোষাকে সজ্জিত মূল সংগঠন যা থেকে হিন্দু জাতির ধারণা প্রবাহিত, বিজেপি'র মত বিভিন্ন সংগঠনকে এই লক্ষ্যে কাজ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হয়।

আর এস এস মত অনুসারে জাতি

'জাতি'র বিকৃত সংজ্ঞা দেওয়ার সময় আর এস এস এক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের উপর সর্ব-হিন্দু লেবেল সেঁটে দেওয়ারই চেষ্টা করছে। এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাসকে সেই ধর্মশাস্ত্রকে ভিত্তি করেই বৈধতা প্রদানের চেষ্টা হয়েছে যে

ধর্মশাস্ত্র নিজ জনগণকেই (শূদ্র ও অতি শূদ্র জাতি- গোষ্ঠীগুলি) মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে এবং তা করার সময় আর এস এস অন্যায়ভাবে জাতি গঠন ও স্বদেশপ্রেমের একচ্ছত্র দাবিও উত্থাপন করেছে। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রসমূহে বর্ণিত আইন অনুযায়ী ভারতকে হিন্দুজাতি হয়ে উঠতে হবে। এই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দেবে আর এস এস (তার পরিবারের সদস্যগণসহ) । গোলওয়ালকরের গ্রন্থে এই দৃষ্টরূপের বীজ ও সারাংশসহ যেভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হয়েছে তা ভীতিজনকভাবে অকপট ও প্রতিপাল্য। এডল্‌ফ হিটলার যেভাবে পৃথিবীতে জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন গোলওয়ালকরও সেভাবেই ভারতে নিকৃষ্টতর ও উৎকৃষ্টতর জাতিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

" হিন্দুস্থানে বিদেশি জাতিগুলিকে (পড়ুন মুসলিম ও খ্রীষ্টানগণ) হয় বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দু সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে হবে, হিন্দু ধর্মকে সম্মান জানানো এবং শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা শিখতে হবে, হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতিকে মহিমান্বিত করা ছাড়া অন্য কোন মতাদর্শকে আমল দেওয়া যাবে না, অর্থাৎ হিন্দু জাতিকেই মান্যতা দিতে হবে এবং নিজেদের পৃথক অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়ে হিন্দু জাতিতে মিশে যেতে হবে, হিন্দু জাতির সম্পূর্ণ অধীনস্ত হয়ে কোনো কিছুর দাবি না জানিয়ে এদেশে থাকতে পারবেন, কোনো সুযোগ সুবিধার জন্য যোগ্য বিবেচিত না হয়ে, কোনো বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থার তো প্রশ্নই উঠে না, এমন কি নাগরিক অধিকারও পরিত্যাগ করতে হবে। এছাড়া তাদের কাছে অন্য কোনো বিকল্প থাকবে না।"

" হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসিরা জার্মানিতে একই ধরনের কর্মসূচী রূপায়ণ করায় গোলওয়ালকর তাদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন। গোলওয়ালকর কি লিখেছেন শুনুন ঃ

" জার্মান জাতি ও অহঙ্কার আজ প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। জাতি ও সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে জার্মানি গোটা পৃথিবীকে বিস্ময়ে হতবাক্ করে দেশকে আসিরীয়, অর্থাৎ ইহুদি মুক্ত করতে অভিযান চালিয়েছে। জাত্যভিমান এখানে সর্বোচ্চ আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। জার্মানি এটাও দেখিয়েছে যেসকল জাতি ও সংস্কৃতির ভিত্তিমূলে পার্থক্য বিদ্যমান তাদের পক্ষে এক ঐক্যবদ্ধ সমগ্র সত্তায় পরিণত হওয়া প্রায় অসম্ভব। হিন্দুস্থানে এটা আমাদের কাছে খুব শিক্ষণীয়, তা থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি।"

জনৈক ইতালীয় গবেষক মার্জিয়া কাসোলারি দেখিয়েছেন ১৯৩০- এর দশকে কিভাবে হিন্দু অতি-জাতীয়তাবাদ ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে বিভিন্ন জাতিকে শত্রুতে পরিণত করেছে। জঙ্গী হিন্দুত্ববাদী নেতারা বারংবার মুসোলিনী ও হিটলারের মতো কর্তৃত্ববাদী নেতা এবং ফ্যাসিবাদী ছাঁচের সমাজের প্রশংসা করেছেন।

আর এস এস এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম

জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশ প্রেমিক তাপ সম্পর্কে আর এস এস - এর উচ্চ রবের দাবি মেনে নিয়ে আপনি মনে করতে পারেন যে এই সংগঠনটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিশ্চয়ই এক মহান ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু আসলে ঘটনা মোটেই তা নয়। যদিও ১৯২৫ সালে আর এস এস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জাতীয় আন্দোলন থেকে এই সংগঠনে কোনো বীরের নাম আপনি পাবেন না, কারণ এই সংগঠনের কোনো নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী ক্ষমতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেননি।

তাদের অন্যতম আইকন হলেন হিন্দুমহাসভার প্রতিষ্ঠাতা ভি ডি সাভারকার। এই সংগঠন ভেঙ্গে আর এস বেরিয়ে যায়। ২০০২ সালে গুজরাটে নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হওয়ার দু'মাস পর প্রথম এন ডি এ সরকার আন্দামান বিমান বন্দরের নাম তার নামে নামাঙ্কিত করে। ভগৎ সিং, সুখদেব এবং আসফাকুল্লার মতো দেশপ্রেমিকগণ নিজেদের প্রাণের বিনিময়েও ব্রিটিশ রাজের কাছে দয়াভিক্ষা চাইতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু বিজেপি'র হিন্দুত্ব মতাদর্শের জনক সাভারকার আন্দামান সেলুলার জেলে আটক থাকা অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সরকারের কাছে ক্ষমাভিক্ষা চেয়েছিলেন।

ক্ষমা প্রার্থনা করে ১৯১৩ সালের ১৪ই নভেম্বর লিখিত চিঠিতে সাভারকার নিজেকে " পিতৃতুল্য সরকারের ঘরে" ফেরার জন্য "এক আকুল আকাঙ্ক্ষী অপচয়ী পুত্র" বলে বর্ণনা করেন। ক্ষমা প্রার্থনা করে তার আগের লেখা ১৯১১ সালের চিঠির উল্লেখ করে সাভারকার লেখেন :

" সরকার যদি তাদের বহুবিধ বদান্যতা ও দাক্ষিণ্য স্বরূপ আমাকে মুক্তি দেন তাহলে সাংবিধানিক অগ্রগতি ও ইংরাজ সরকারের প্রতি আনুগত্যের একনিষ্ঠতম সমর্থক না হয়ে আমি পারবো না..... .... আর সেই অগ্রগতির প্রধানতম শর্তই হলো এই সরকার। আমাদের মুক্তি দেওয়া হলে জনগণ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হর্ষধ্বনি করবে। কেননা এই সরকার জানে সংশোধনের জন্য শান্তি প্রদান এবং প্রতিহিংসা গ্রহণ করার পরিবর্তে কিভাবে ক্ষমা প্রদর্শন করে সংশোধনের সুযোগ দিতে হয়।"

সাভারকার আরো বলতে গিয়ে যোগ করেন :

" অধিকন্তু, সাংবিধানিক লাইনে আমার পরিবর্তন ভারতে ও ভারতের বাইরে সকল বিপক্ষে চালিত যুবকদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবে যারা এক সময় তাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে আমার দিকেই চেয়ে থাকতেন। সরকার যেভাবে চাইবেন আমি সেভাবে যে কোন পদাধিকার নিয়ে তাদের সেবা করতে প্রস্তুত। কারণ আমার পরিবর্তন যেমন বিবেকবুদ্ধিপূর্ণ, আমি আশা করি আমার ভবিষ্যৎ আচরণও সেরকমই হবে। আমাকে

জেলে রেখে যে উদ্দেশ্য সাধিত না হবে, আমাকে অন্যভাবে কাজে লাগালে ফল হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই ক্ষমাশীল হতে পারেন। তাই পিতৃতুল্য সরকারের দরজায় ফিরে না গিয়ে অপচয়ী পুত্র কোথায় ফিরতে পারে?"

স্বাধীনতার জন্য ভারতের সংগ্রামে আর এস এস ও তার ভূমিকা সমান লজ্জাজনক। ১৯৩০- ৪০'এর দশকের অনেক ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম থেকে আর এস এস নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, যেমন, ১৯৩০ - ৩১ এর আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, আজাদ হিন্দু ফৌজ - ১৯৪৫ - ৪৬ এর আই এন এ'র বিচার এবং বোম্বেতে নৌবিদ্রোহ। পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা শেষে ঐতিহাসিকদের রচিত Khakhi Shorts and Saffron Flags (ওরিয়েন্ট-লংম্যান) বইতে এই আন্দোলনের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। জিহ্বার মুসলিম লীগসহ সমস্ত সাম্প্রদায়িক সংগঠনের মতো প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'র আহ্বানের ফলশ্রুতিতে ১৯৪৬ - ৪৭'র ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের পর আর এস এস'র দ্রুত বিস্তার ঘটে। ১৯৪৬ সালের কলকাতা হত্যাকাণ্ডে গান্ধীজীকে হতাশায় তাড়িত করার প্রেক্ষিতে আর এস এস ঐ সময়টাকে 'সুন্দরতম মুহূর্ত' হিসাবে চিহ্নিত করে।

আর এস এস এবং হিন্দু মহাসভা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল

শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী (জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিজেপি'র অগ্রদূত) মুসলিম লীগ সদস্য ফজলুল হক- এর নেতৃত্বাধীন বাংলা সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দেন তখন মুখার্জী ৯ আগস্ট, ১৯৪২ মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি।" বিপরীতে তিনি বাংলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব দেন ঃ

" প্রশ্ন হলো বাংলায় কিভাবে এই আন্দোলনের (ভারত ছাড়ো) মোকাবিলা করা হবে? এই প্রদেশের এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই আন্দোলন এই প্রদেশের গভীরে পৌঁছতে না পারে। আমাদের পক্ষে, বিশেষতঃ দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের পক্ষে জনগণকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব যে, যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কংগ্রেস এই আন্দোলন শুরু করেছে তা আমরা ইতোমধ্যেই এই প্রদেশে জনগণের প্রতিনিধিরা অর্জন করেছেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে এই স্বাধীনতা সীমিত হতে পারে। ভারতীয় জনগণকে ব্রিটিশদের আস্থা রাখতে হবে,ব্রিটেনের স্বার্থে নয়, ব্রিটিশরা সুবিধা ভোগ করতে পারবেন এজন্যও নয়, এই প্রদেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য। এই প্রদেশের গর্ভনর, অর্থাৎ সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে আপনি আপনার মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হবেন।"

নাথুরাম গড্‌সের প্রতি তাদের নির্লজ্জ ভক্তির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করে। ১৯ জানুয়ারি, ১৯৯৮ আউটলুক পত্রিকায় প্রকাশিত আর এস এস সরসঙ্ঘচালক রাজু ভাইয়া গড্‌সের কাজের সাফাই গেয়ে বলেন, গড্‌সে অখন্ড ভারতের দর্পণ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। ওস্‌কে মন্তব্য আচ্ছে থী পর ওস্‌নে আচ্ছে উদ্দেশ্য কি লিয়ে গলৎ মেথড ইস্তেমাল কিয়া (তার উদ্দেশ্য ছিল ভালো, কিন্তু সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে তিনি ভুল প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছেন)।"

গান্ধীজীর হত্যাকান্ডের পর আর এস এস প্রধান গোলওয়ালকরকে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল যে চিঠি লেখেন তা ছিল মর্মন্তুদ। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন গান্ধীর হত্যার পর আরএস এস 'এর লোকেরা মিষ্টি বিলিয়েছিল। সেপ্টেম্বর ১১,১৯৪৮ তারিখের চিঠিখানা দেশরাজ গোয়েলের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক পত্রিকা থেকে পুরোটাই তুলে ধরা হলো। চিঠির পুরো বয়ান এরকম ঃ

" ..... আর এস এস'র বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আপনি ভালোভাবেই অবহিত আছেন। এসব চিন্তাভাবনা আমি গত বছর ডিসেম্বরে জয়পুরে এবং জানুয়ারিতে লক্ষ্ণৌতে ব্যক্ত করেছি। জনগণ এসব মতামত ভালোমনেই গ্রহণ করেছেন। আমি আশা করেছিলাম আপনাদের লোকজনও তা মেনে নেবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আর এস এস' এর লোকজনদের উপর তার কোনই প্রভাবই পড়েনি। তাদের কর্মসূচীরও কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে আর এস এস হিন্দু সোসাইটির সেবা করেছে। যেসব অঞ্চলে সাহায্যও সংগঠনের প্রয়োজন ছিল সেখানে আর এস এস'এর যুবকরা নারী ও শিশুদের রক্ষা করেছে এবং তাদের জন্য কঠোর চেষ্টা করেছে। এ সম্পর্কে বোধবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো মানুষের আপত্তি করার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু আপত্তিজনক ব্যাপার ঘটে তখনই যখন তারা প্রতিশোধ গ্রহণে অন্ধ হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ শুরু করে। হিন্দুদের সংগঠিত ও সাহায্য করা এক কথা, কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিরপরাধ ও অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুদের আক্রমণ করা অন্য কথা।

এছাড়া, কংগ্রেসের প্রতি তাদের বিরোধিতা, তাও এতটা বিষবাষ্পপূর্ণ এবং ভদ্রতা, শিষ্ঠাচার ও শোভনতা বর্জিত যে তা জনগণের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। তাদের সমস্ত বক্তৃতা সাম্প্রদায়িকতার বিষে পরিপূর্ণ। হিন্দুদের রক্ষার জন্য তাদের সংগঠিত করা, উৎসাহিত করা এবং বিষ ছড়ানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। বিষ ছড়ানোর চূড়ান্ত পরিণতি হলো দেশকে গান্ধীজীর জীবন বিসর্জন দিয়ে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। সরকার বা জনগণ কারো পক্ষ থেকেই আর এস এস' এর প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতির অবশিষ্ট ছিল না। বস্তুতঃপক্ষে বিরোধিতা গড়ে উঠে। বিরোধিতা আরো তীব্র আকার

হিন্দু মহাসভা সিন্ধু প্রদেশে মুসলিমের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকারে ছিল। সেই প্রদেশের বিধানসভা পাকিস্তান সৃষ্টির দাবি গ্রহণ করে একটি প্রস্তাব পাস করেছিল। মুখার্জী এবং অন্যান্য মহাসভা নেতৃবৃন্দ সরকার থেকে পদত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। এল কে আদবানির বিজ্ঞ পরামর্শদাতা মহাসভা প্রেসিডেন্ট সাভারকার এক নির্দেশ জারি করে বলেন, তারা যে যে পদে রয়েছেন, সে পদে থেকেই তাদের ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করুন, পদত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে ৩১ আগস্ট, ১৯৪২ তারা একটি প্রস্তাব পাশ করে মহাসভা সদস্যদের তাদের স্ব স্ব পদে বহাল থাকার এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করার আহ্বান জানান।

মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী গড্‌সে এবং আর এস এস

২০১৪- এর মে মাসে দ্বিতীয় এন ডি এ সরকার ক্ষমতাসীন হবার কয়েক মাসের মধ্যে (সরকারের নেতৃত্বে আসেন এমন এক ব্যক্তি যিনি তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন প্রচারক হিসেবে) আর এস এস ও হিন্দু মহাসভা গান্ধীজীর হত্যাকারী নাথুরাম গড্‌সকে নির্ভীক পুরুষ হিসেবে ঘোষণার দাবিতে হৈ চৈ শুরু করে। গ্লোবাল হিন্দু ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রনালয়ের কাছে দাবি জানিয়েছিল নাথুরাম গড্‌সেকে জাতীয় বীর হিসেবে মর্যাদা দিয়ে ভারতীয় স্কুলসমূহের পাঠ্যপুস্তকে যেন ঠিক সেভাবেই তাকে স্থান দেওয়া হয়। ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিকৃতি ঘটিয়ে ঐ চিঠিতে বলা হয় যে গড্‌সে " ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লড়াই করেছিলেন। এই চিঠিকে savetemples. org. ওয়েব সাইটের হোম পেজে স্থান দেওয়া হয়। ওয়েভ সাইটটির নাম হলো " হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু মন্দির রক্ষা মিশন।" 'Project of Global Hindu Heritage (GHHF) USA' হিসেবে দাবি করে এই সংস্থাটি ২০১২ সালের জুন মাসে হায়দ্রাবাদ নগরীতে স্থাপিত Save Temple Office এর বাইরে থেকে কাজ করে।

এন আর আই প্রতিষ্ঠানের হয়ে এহেন ওকালতির অল্প কিছু দিন পর, ডিসেম্বর ১১, ২০১৪ তারিখ, বিজেপি'র এক পার্লামেন্ট সদস্য সাক্ষী মহারাজ নাথুরাম গড্‌সকে দেশপ্রেমিক হিসেবে উল্লেখ করেন। রাজ্যসভায় যেখানে শাসক দল সংখ্যালঘিষ্ঠ, সেখানে এর প্রতিবাদে তুমুল হৈচৈ'র ফলে তিনি ক্ষমা চাইতেবাধ্য হন। ঐ ঘটনার কিছুদিন আগে এই সাক্ষী মহারাজই মাদ্রাসার বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। এই বিষোদ্গার পরে মাদ্রাসাকে ছাড়িয়ে ভারতীয় মুসলিমদের বিরুদ্ধেও ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অতি সম্প্রতি তিনি হিন্দু নারীদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন প্রত্যেকে যাতে কমপক্ষে চার জন সন্তানের জন্ম দিয়ে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও জাতির সেবায় এগিয়ে আসেন।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আর এস এস 'র ঘৃণা এবং বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডে তাদের সংস্রবই

ধারণ করে যখন গান্ধীজীর মৃত্যুর পর আর এস এস- এর লোকেরা উল্লাসে মেতে উঠে এবং মিষ্টি বিতরণ করে। এই পরিস্থিতিতে সরকার আর এস এস' এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

তারপর ছয় মাসেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম এতটা সময় চলে যাওয়ার পর, সমস্ত দিক বিবেচনা করে আর এস এস' এর লোকেরা ঠিক পথে ফিরে আসবে। কিন্তু আমার কাছে যেসব রিপোর্ট তা থেকে পরিষ্কার যে তাদের আগের কার্যকলাপে নতুন করে প্রাণ সঞ্চারের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।...."

নতুন জাতি হিসেবে ভারতের জন্ম এবং
তার পতাকা সম্পর্কে আর এস এস' এর দৃষ্টিভঙ্গি

আর এস এস'এর ইংরাজী মুখপত্র অর্গানাইজার- এর তৃতীয় সংখ্যা (জুলাই১৭, ১৯৪৭) ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাকে ভারতের গণপরিষদ ভারতের জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণ করায় প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করে। ঐ সংখ্যায় জাতীয় পতাকা শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে দাবি জানানো হয়, ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা নয়, তার পরিবর্তে গেরুয়া পতাকাই গ্রহণ করা হোক। একই দাবি ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে সবগুলি সম্পাদকীয় নিবন্ধে প্রকাশিত হতে থাকে। (জুলাই ৩১ এর সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনামে "হিন্দুস্থান" এবং আগস্ট ১৪, ১৯৪৭ তারিখের সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম' হিন্দুস্থান' এবং আগস্ট ১৪,১৯৪৭ তারিখের সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম' উৎইদ্যার' বা কোথায়) পতাকার রঙের বিরোধিতার সাথে সাথে ভারতীয়দের সম্পর্কে মিশ্র জাতির ধারণার বিরোধিতা করা হয়। ১৪ আগস্টের সংখ্যায় 'ভাগ্য ধ্বজ' (গেরুয়া পতাকা) এর পেছনে রহস্য' আরেকটি নিবন্ধও প্রকাশিত হয়। ঐ নিবন্ধে দিল্লির লাল কেল্লার প্রাকারে গেরুয়া পতাকা উত্তোলনের দাবি জানানোর পাশাপাশি নিম্নলিখিত ভাষায় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাকে জাতীয় পতাকা হিসাবে বেছে নেওয়ার বিষয়টাকে কালিমালিপ্ত করা হয় :

" ভাগ্যের পদাঘাতে যারা ক্ষমতায় এসেছেন তারা আমাদের হাতে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা তুলে দিতে পারেন বটে, কিন্তু হিন্দুরা কখনো তা মেনে নেবে না এবং এই পতাকার প্রতি শ্রদ্ধাও জানাবে না। তিন শব্দটাই অশুভ। যে পতাকায় তিন রকমের রঙ থাকবে তা অবশ্যই মনোবিদ্যাগত প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে যা একটি দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক।"

আর এস এস কখনো ভারতের বিশাল এবং সমৃদ্ধ বৈচিত্রকে স্বীকার করেনি, সে বৈচিত্র ভাষার ক্ষেত্রে হোক বা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে অথবা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। ১৪ জুলাই, ১৯৪৬ তারিখ নাগপুরে এক সমাবেশে ভাষণে গোলওয়ালকর বলেন গেরুয়া পতাকাই একমাত্র পতাকা যা সামগ্রিকভাবে তাদের মহান সংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্ব করে। ইহা ঈশ্বরের

মূর্ত্ত প্রকাশ : তিনি ঘোষণা করেন, " আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে অবশেষে সমগ্র জাতি এই গেরুয়া পতাকার সামনে মাথা নত করবেই।"

এমন কি স্বাধীনতার পরও যখন ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাই ভারতের জাতীয় পতাকা হিসেবে গৃহীত হয় আর এস এস তখনও এই পতাকাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। আর এস এস' এর সদর দপ্তরে প্রথম বারের জন্য ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় ২০০০ সালে এন ডি এ ক্ষমতায় আসার পর।

আর এস এস ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাকে ব্যবহার করেছে কেবল মাত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে উন্মাদনা সৃষ্টির উদ্দেশ্য। ১৯৯১ সালে (একতা যাত্রা) আর এস এস পরিবারের অন্যতম প্রিয় নেতা মুরলী মনোহর যোশী যখন কাশ্মীরের শ্রীনগরের লাল চকে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করতে যান তখন উমা ভারতী একটি ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা সঙ্গে নিয়েছিলেন কারণ স্থানটি ছিল একটি ইদগাহ্, হিন্দুত্ববাদীরা যেটিকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল। অন্যদিকে এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৯২ সালে হিন্দুত্ববাদী ক্যাডাররা যখন বাবরি মসজিদ ধ্বংস করতে যায় তারা কিন্তু কোন ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা সঙ্গে নিয়ে যায়নি। তারা কেবল গেরুয়া পতাকাই সঙ্গে নিয়ে গেছিল যেটি তারা পরে সেখানে উত্তোলন করে। আর এস এস এক উভয় সঙ্কটের মুখোমুখি। হিন্দুদের জন্য গেরুয়া পতাকা, আর মুসলিমদের জন্য ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা।

আর এস এস' এর ইতিহাস এবং এই ইতিহাস সম্পর্কে তাদের গর্ব আজ ভারতে তাদের কাজের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে, যা ভারতের সংবিধানের মূল স্তম্ভগুলির সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

সূত্র ঃ

১। শূদ্র জাতিরা হলো শ্রমজীবী জাতি, কৃষক ও কারিগর, আর অতি শূদ্রদের বলা হয় অস্পৃশ্য (দলিত) যাদের জন্ম হয়েছে ভৃত্য হিসেবে এবং দৈহিক শ্রম করে কাজ করার জন্য।

২। হিন্দুত্বের বৈদেশিক সম্পর্কে ১৯৩০ সালে আর্কাইভ্যাল এভিডেন্স ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, জানুয়ারি ২২,২০০০

৩। চিঠিখানা পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে পেনাল সেটেলমেন্ট ইন আন্দামানস্ ইউনিয়ন মিনিস্ট্র অব গেজেটীয়ারস্ কর্তৃক প্রকাশিত।

৪। দি জেনেসিস অব আর এস এস— গোবিন্দ সহায়

৫। ঐ

সঙ্ঘের রক্তাক্ত পথের শেষে

তিস্তা শীতলবাদ

হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলো বলে এসেছে যে সব সময় মুসলিমরাই দাঙ্গা শুরু করে ফলে আত্মরক্ষার্থে হিন্দুদের যথাযোগ্য প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশে সংগঠিত দাঙ্গার ঘটনার তদন্তে নিযুক্ত এক সদস্যক সরকারি বিচার বিভাগীয় কমিশন যতগুলি ঘটনার তদন্ত করেছে তার প্রতিটিতেই আর এস এস ও অন্যান্য সংখ্যাগুরু অংশের সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলিকেই দোষী সাব্যস্ত করেছে। নীচে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো ঃ

১৯৬৯ সালের আহ্মেদাবাদ দাঙ্গার তদন্তে নিযুক্ত বিচারপতি জগমোহন রেড্ডি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ঃ

" শুধু গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতাই নয়, ব্যর্থতা ছিল হিংসা ছড়িয়ে পড়ার মুখে তা কঠোরভাবে দমন করার ক্ষেত্রেও। তার উপর কমিশনের কাছে প্রকৃত সত্য চেপে যাওয়ার সচেতন প্রয়াসও লক্ষ্য করা গেছে, বিশেষত: কয়েকজন আর এস এস ও জনসঙ্ঘ নেতার দাঙ্গায় অংশগ্রহণের ঘটনা।"

১৯৭০ সালের ভিওয়ান্ডি জলগাঁও এবং মহদের সাম্প্রদায়িক গোলমালের ঘটনার তদন্তে নিযুক্ত বিচারপতি ডি পি মদন তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ঃ

"... উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো রিপোর্টে থানে জেলার এস পি লিখেছেন " আমি দেখেছি যে, একাংশের হিন্দু,বিশেষত: আর এস এস এবং কিছু পি এস পি'র লোকজন গোলমাল সৃষ্টি করতে মরিয়া ছিল। মিছিলের সঙ্গে যেতে তাদের উদ্দেশ্যে যতটা না ছিল মহান শিবাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা, বস্তুতঃ তাদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সম্ভব হলে মুসলিমদের হেয় প্রতিপন্ন করা।"

" ১৯৭০ সালেই প্রথম বারের মতো গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীদের প্রতি ভিওয়ান্ডির শিবাজী জয়ন্তী প্রসেশনে অংশগ্রহণের আবেদন জানানো হয়। এবারই প্রথম বছর যে জনসঙ্ঘ ও এস এস- এর শাখা সংগঠন রাষ্ট্রীয়, উৎসব মন্ডলে যোগ দেওয়ার জন্য গ্রামবাসীদের জড়ো করা হয়েছিল। গ্রামবাসীদের জড়ো করার পেছনে এই সংগঠনগুলোর উদ্দেশ্য ছিল " মুসলিমদের ভয় দেখানো।" মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের হাতে ছিল লাঠি, লাঠিতে বাঁধা ছিল ভাগ্যা (গেরুয়া) পতাকা, জনসঙ্ঘ, রুম এবং এস এস এর ব্যানার

প্রদর্শন করছিল মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা।

গ্রামবাসীরা প্ররোচনামূলক মুসলিম বিরোধী শ্লোগান দিচ্ছিল, মারমুখী আচরণ করছিল, নিষ্ক্রিয় পুলিশের সহায়তায় দরগা রোড ও সূতার গলি জংশনে অবস্থিত হায়দরী মসজিদ এবং বঙ্গ দলগুলিতে অবস্থিত মোতি মসজিদের উপর গুলাল নিক্ষেপ করছিল।

১৯৭১ সালের তেল্লিচেড়ির ঘটনার তদন্তে নিযুক্ত বিচারপতি জোসেফ ভিথিয়াথিল তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ঃ

" তেল্লিচেড়িতে হিন্দু ও মুসলিমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরস্পর ভাই হিসেবে বসবাস করে আসছে। মোপিয়া দাঙ্গার ঘটনা তেল্লিচেড়ির দুই সম্প্রদায়ের বহু শতাব্দীব্যাপী আন্তরিক সম্পর্কের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। আর এস এস ও জনসঙ্ঘ এখানে তাদের ইউনিট গড়ে তুলে কাজকর্ম শুরু করার পরই পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আসে। তাদের মুসলিম বিরোধী প্রচার এবং সাম্প্রদায়িক সংগঠনকে কেন্দ্র করে সমবেত মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া, মুসলিম স্বার্থের সেরা প্রহরী মুসলিম লীগের নড়াচড়া আর এসবের ফলশ্রুতিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গোলমালের পটভূমি প্রস্তুত করে।"

১৯৭৯ সালে জামসেদপুর সাম্প্রদায়িক গোলমালের ঘটনার তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ঃ

" সরকারি অফিসারদের সাক্ষ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক গন্ডগোলের ঘটনার পর অন্যান্য উৎসবের মত রাম নবমী উৎসবও আইন- শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের কাছে নজরদারি ও সতর্কতা জারি রাখার বিষয় হয়ে উঠে। সাথে সাথে রাম নবমীর মিছিলের সংখ্যাও বাড়তে বাড়তে ১৯৭৯ সালে ৭৯টিতে এসে দাঁড়ায়। নির্বাচনের আগে সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের যে প্রস্তুতি চলছিল সে সম্পর্কে গোয়েন্দা দপ্তরের জামশেদপুর শাখা (মার্চ ২৩, ১৯৭৯ ইং) যে রিপোর্ট তৈরি করেছিল তাতে ৩১ শে মার্চ থেকে ১লা এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় আর এস এস ' এর ডিভিশন্যাল কনফারেন্সের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে সরসঙ্ঘচালকের অংশগ্রহণের কথা ছিল।

মিছিলের পথ নিয়ে বিবাদ (প্রশাসন পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করে মুসলিম এলাকার মধ্য দিয়ে মিছিল যাওয়া যাবে না বলে অনুমতি দিতে অসম্মতি জানায়)তীব্র হয়ে উঠে, পাল্টা উত্তেজিত প্রতিক্রিয়া আসে কয়েকজন লোকের একটিগ্রুপের দিক থেকে যারা নিজেদেরকে "সংযুক্ত বজরং বলি আখড়া সমিতির" লোক বলে দাবি করছিল এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির লক্ষ্যে সুসম্বন্ধভাবে পুস্তিকা বিতরণ করছিল। আর এস

এস' এর সঙ্গে এদের সাংগঠনিক যোগ ছিল। প্রশাসন যখন একটি নির্দিষ্ট পথ দিয়ে মিছিল যেতে অসম্মতি জানায় তখন উচ্ছৃঙ্খল জনতা হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠে, মুসলিম বিরোধী শ্লোগান দিতে থাকে। এরপর আগুন জ্বালানোর মতো প্রচারপত্র (" শ্রীরামনবমী কেন্দ্রীয় আখড়া সমিতির পক্ষে প্রচারিত) জামসেদপুর ঘুরে। একাজ হিন্দুদের অনুভূতিকে আঘাত করে তাকে তুঙ্গে তোলার চেষ্টার চেয়ে এটা কম কিছু ছিল না। ঘটনাকে বিকৃত করা এবং কিছু ব্যবস্থাকে হিন্দুদের উপর আক্রমণ হিসাবে প্রচার করা ইত্যাদি এক ষড়যন্ত্রের অংশ বলেই মনে হয়।

একটি সমীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছিল যে, সকল পুলিশ কর্মী, হাবিলদার, হোমগার্ড প্রভৃতিরা অন্তরের দিক থেকে ওদেরকে (হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলিকে) সমর্থন দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। কি ধরনের পরিকল্পনা চলছিল এসব ঘটনাবলী তা সুস্পষ্টভাবে শুধু দেখিয়ে দিচ্ছে না, পুলিশের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার হাত থেকে সাধারণভাবে এদের সুরক্ষা দেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল, কেননা পুলিশ বাহিনীর নীচের স্তরের কর্মীদের মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গী এদের পক্ষেই চলে গিয়েছিল।

১৯৮২ সালের কন্যাকুমারী দাঙ্গার (হিন্দু এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী মুখোমুখি সংঘর্ষজনক পরিস্থিতির) তদন্তে নিযুক্ত বিচারপতি বেনুগোপাল কমিশন ঃ

যা কিছুকেই আর এস এস সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের অধিকার বলে মনে করে তা রক্ষায় ওরা নিজেদের চ্যাম্পিয়ান হিসেবে তুলে ধরে এবং গ্রহণ করে এক জঙ্গি ও মারমুখী দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের স্থান কোথায় তা সংখ্যালঘুদের শেখাবার দায়িত্ব এই সংগঠনটি নিজের হাতেই তুলে নিয়েছে। যদি ওদের শিখবার ইচ্ছা না থাকে তবে ওদের শেখাবার দায়িত্ব সংগঠনটিই পালন করবে। আর এস এস' এর সাম্প্রদায়িক হিংসায় প্ররোচনা দেওয়ার ধরণটা এরকম ঃ

(ক) খ্রীষ্টানরা এদেশের অনুগত নাগরিক নয় এমন প্রচার চালিয়ে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগিয়ে তোলা,

(খ) সংখ্যালঘু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং হিন্দুদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে চলেছে এমন সুচতুর প্রচার চালিয়ে সংখ্যাগুরু জনগণের মধ্যে ভয় সুদৃঢ় করা;

(গ) প্রশাসনে অনুপ্রবেশ করে সিভিল ও পুলিশ সার্ভিসের সদস্যদেরকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব বাড়িয়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করা;

(ঘ) সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের যুবকদের ভোজালি, তরবারি এবং বর্শার মতো অস্ত্রের ট্রেনিং প্রদান করা;

(ঙ) সাম্প্রদায়িক ফাটলকে বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্যে গুজব ছড়ানো এবং সাম্প্রদায়িক

মনোভাব গভীরতর করার উদ্দেশ্যে যে কোনো সামান্য ঘটনাকেও সাম্প্রদায়িক রঙ প্রদান করা।

১৯৯৩ সালে বোম্বের সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ রিপোর্ট ঃ

১৯৯৩ সালে বোম্বেতে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক হিংসাশ্রয়ী ঘটনার তদন্তে নিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ রিপোর্ট বিজেপি, শিবসেনা নেতা এবং পুলিশকে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছিল কংগ্রেস সরকার সেগুলোর একটিও রূপায়িত করেনি।

লিবেরহান কমিশন

এক ঝাঁক নেতার নেতৃত্বে হাজার হাজার আর এস এস-ভি এইচ পি- বজরং দল কর্মী ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় যখন বল প্রয়োগে বাবরি মসজিদ ধূলিস্যাৎ করে দেয়, কেন্দ্রীয় সরকার বিচারপতি এম এস লিবেরহানের নেতৃত্বে সেই ঘটনার তদন্তের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করে। ১৬ বছর পর ২০০৯ সালে কমিশন সরকারের কাছে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়। রিপোর্টে সঙ্ঘ পরিবারের দাবিকে নস্যাৎ করে বলা হয় মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, ছিল না অপরিকল্পিত। এল কে আদবানি, রাজনাথ সিং, কল্যাণ সিং প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে কমিশন ষড়যন্ত্রে জড়িত বলে ঘোষণা করে। তারপর আরও ৬ (ছয়) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। মোকদ্দমাগুলিকে নানা বিষয় মিশিয়ে হাল্কা করে দেওয়া হয়েছে। নিজস্ব প্রয়োজনে আদালতগুলিও সময় নিয়েছে ফলতঃ এতগুলি বছরের মধ্যে মসজিদ ধ্বংসে লিপ্ত একজন অপরাধীরও কোনো সাজা হয়নি।

উপরের তালিকা থেকেই দেখা যাবে যে অধিকাংশ মোকদ্দমায় একজন অপরাধীকেও কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য করা হয়নি। যদিও এদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক হিংসায় সহযোগিতা করার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।

২০০২সালে গুজরাটের গণহত্যায় আর এস এস এবং বিজেপি ক্যাডারদের ভূমিকা যথেষ্ট দলিল-পত্র দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে। ১২৬ জন ক্ষমতাবান অপরাধীকে এখন পর্যন্ত শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং জাকিয়া জাফরি হত্যা মোকদ্দমা চলতে থাকা প্রসিডিংস অনুযায়ী প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরে কি ঘৃণ্য অপরাধমূলক চক্রান্ত রয়েছে এর পেছনে।

হিন্দুত্বের নামে সন্ত্রাস

(একটি সংকলন)

সন্ত্রাসবাদী ও তাদের কার্যকলাপ ভারতের কাছে এক ভয়ঙ্কর বিপদ হিসেবে উপস্থিত। ভারতের প্রত্যেক নাগরিককে সন্ত্রাসবাদী ও তাদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে সমবেত করতে হবে। এসব আক্রমণের ঘটনায় জড়িত সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিত করে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে। এ কাজটা করার ক্ষেত্রে ভুলে যেতে হবে এদের মধ্যে কে কোন্ গোষ্ঠীভুক্ত কিংবা কে কোন্ ধর্মের পক্ষে বলে দাবি করে। যদিও সন্ত্রাসের কোনো ধর্ম নেই, সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি কিন্তু ধর্মের নামেই প্রায়শ কাজ করে। এটাও সত্য যে বিভিন্ন দেশে মুসলিম মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি নির্দোষ জনগণের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে সমর্থন করেছে এবং মদত যুগিয়েছে । এসব সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী এবং তাদের নেতৃবৃন্দ দীর্ঘদিন সি আই এ এবং অন্যান্য আমেরিকান রাষ্ট্রীয় এজেন্সিগুলির সমর্থন পেয়েছে। এরা তখন আমেরিকা যেসব দেশের সরকারগুলোকে সোভিয়েতপন্থী বলে মনে করতো তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি আমেরিকার পক্ষে কঠোরভূমিকা পালন করেছে। এসব গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ইসলামিক স্টেট হলো সাম্প্রতিকতম এবং সবচেয়ে ভয়ংকর।

ইসলামিক দেশসহ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল গণতন্ত্রপ্রিয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিকগণ এব সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির তীব্র নিন্দা করেছেন।

সেপ্টেম্বর ১১,২০০১ তারিখের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামের কুৎসা করার জন্য এবং সকল মুসলিম জনগণকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচারাভিযান সংগঠিত করেছিল। ভারতে বিজেপি এই বিকৃত বোধবুদ্ধিরই প্রতিধ্বনি করেছিল। ২৬ নভেম্বর, ২০০৮ মুম্বাইতে পাকিস্তানের পরিকল্পিত আক্রমণ এই প্রচারিভাযানকেই শক্তি যুগিয়েছিল। কিন্তু সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিজেপি'র অবস্থানের চূড়ান্ত ভন্ডামি হিন্দুত্বের নামে শপথগ্রহণকারী প্রচারকদের গোষ্ঠীগুলির প্রতি তাদের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি তো উদাহরণ দ্বারাই ব্যাখা করা হয়েছে।

ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আর এস এস এর ঘৃণার কর্মসূচিকে ভি এইচ পি , বজরং দল, দুর্গা বাহিনীর মতো তার ফ্রন্ট সংগঠনগুলি চূড়ান্ত রূপ প্রদান করেছিল । হিন্দুত্বের নামে শপথ নিয়ে এই সংগঠনগুলিও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে । সমঝোতা এক্সপ্রেস (ফেব্রুয়ারি ১৮,২০০৭), মেক্কা মসজিদ, হায়দ্রাবাদ (মে ১৮,২০০৭), আজমের দরগা শরিক (অক্টো, ২০০৭) মালেগাঁও (সেপ্টেম্বর ২৯, ২০০৮) বোমা বিস্ফোরণ

ঘটেছিল। এসব ঘটনায় বহু নির্দোষ মানুষ হয় নিহত বা আহত হয়েছেন।

তদন্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে যে হিন্দুত্বের মতাদর্শের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণকারী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে লক্ষ্য করে বিস্ফোরণের পরিকল্পনা তৈরি করেছে এবং তা কার্যকরী করেছে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব যিনি অবসর গ্রহণের পর বিজেপি'তে যোগদান করার পর সংসদের সামনে বলেছেন যে, অন্তত পক্ষে ১০ জন অভিযুক্তের আর এস এস -র সঙ্গে খোলাখুলি সম্পর্ক ছিল অথবা বিজেপি'তে তারা বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিল।

এদের গ্রেপ্তারের সময় উঁচু স্তরের বিজেপি নেতৃত্ব কারাগারে গিয়ে দোষীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। ঐসব নেতৃত্ব তৎকালীন ইউ পি এ সরকারকে আক্রমণ করে অভিযোগ করেন যে সরকার অন্যায়ভাবে "সাধুসন্তদের" গ্রেপ্তার করেছে। প্রকৃতপক্ষে এসব গোষ্ঠীর অপরাধমূলক কাজকর্ম বিজেপি ও আর এস এস' এর তথাকথিত দেশপ্রেমিক দাবির মুখোশই সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত করে দিয়েছে।

(অভিযুক্তদের মধ্যে একজন ছিলেন অসীমানন্দ। তিনি কারাভান সাময়িকপত্রে ফেব্রুয়ারি, ২০১৪) ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন।)

তিনটি সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনায়, যেগুলিতে ৮২ জনের প্রাণ গেছে, অসীমানন্দ জড়িত। অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনাগুলি সম্পর্কে তদন্ত চলছে। সকলেই জানেন যে আর এস এস'-র বনবাসী কল্যাণ সঙ্ঘম নামক সংগঠনের সঙ্গে তিনি গুজরাটের উপজাতি এলাকায় কাজ করছিলেন। সাক্ষাৎকার অনুযায়ী গুজরাটের এই জায়গাটাতে ২০০৫-র জুলাই মাসে সুরাটে, আর এস এস' এর এক মিটিং-এর পর, আর এস এস'র বর্তমান প্রধান মোহন ভাগবৎ, আর এস এস-র প্রচারক ইন্দ্রেস কুমারের সঙ্গে (এখন যিনি আবার এই সংগঠনের তথাকথিত মুসলিম ফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত) গুজরাটের ডঙ্গে- এর একটি মন্দিরে যান। মন্দিরে ছিলেন অসীমানন্দ। ভারতের চারদিকে অনেকগুলি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলকে লক্ষ্যবস্তু করে তারা আলোচনা করেন। আলোচনার বিষয় ছিল বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এই অঞ্চলগুলিকে বিধ্বস্ত করা।

সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় ভাগবৎ তাকে বলেন যে " আমরা এই বিস্ফোরণের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করবো না, যদি তোমরা এসব করতে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো তোমরা আমাদেরকে সঙ্গে পাবে... যদি তোমরা কাজে নামো আমরা তোমাদের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবো..... একাজকে মতাদর্শের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। হিন্দুদের জন্য একাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুগ্রহ করে কাজটা করো। আমাদের আশীর্বাদ তোমাদের সঙ্গে থাকবে।"

অসীমানন্দের জনৈক আইনি প্রতিনিধি এই সাক্ষাৎকারের কথা অস্বীকার করেছেন।

প্রকাশনার পক্ষে বলা হয়েছে যে, এই সাক্ষাৎকার টেপে ধরা আছে, আর সবগুলো টেপই পাওয়া যাবে। একটি ম্যাগাজিনকে দেওয়া (কারাভান, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪) অসীমানন্দের সাক্ষাৎকারে উদ্ঘাটিত বিস্ফোরক তথ্য আর এস এস'এর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এবং অসামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর সন্ত্রাসবাদীদের ঘটানো ধারবাহিক বিস্ফোরণের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এক্ষেত্রে যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছে সে সম্পর্কে আরও তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এই বিস্ফোরণের ঘটনাগুলিতে প্রধান অভিযুক্ত হলেন অসীমানন্দ।

নির্দোষ মুসলিমদের জেল

সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও যে দু'রকমের মাপকাঠি ব্যবহৃত হয় তা মুসলিম যুবকদের গ্রেপ্তার ও তাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। কারণ এরা যে মুসলিম! মালেগাঁও কেইসের ক্ষেত্রে হোক বা মেক্কা মসজিদের কেইসের বিষয়েই হোক যেখানে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি বোমা আক্রমণে জড়িত ছিল, অথবা অন্য সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনার ক্ষেত্রেই হোক, প্রথমত, মুসলিম যুবকদেরকেই গ্রেপ্তার ও জেলে পাঠানো হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত বিচারাধীন বন্দী হিসেবে এদেরকে জেলে কাটাতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত আদালত এদেরকে সসম্মানেই মুক্তি দেয়।

প্রকৃতপক্ষে এধরনের ভুরি ভুরি কেইস প্রকাশ্যে এসেছে, যেখানে মুসলিম যুবকদের অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বিচারের এমন গুরুতর ব্যর্থতার ক্ষেত্রে এবং যুবকদের সম্পর্কে একপেশে চিত্রাঙ্কণ ও তাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপার স্যাপার দেখেও কংগ্রেস ও বিজেপি এদু'টি রাজনৈতিক দলই নীরব ছিস। কারণ ঐ যুবকরা ছিলেন সকলেই মুসলিম। এই যুবকদের প্রতি সুবিচার চেয়ে সি পি আই (এম) পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে প্রচারাভিযান সংগঠিত করেছে। এমনকি তাদের কেইসগুলি মহামান্য রাষ্ট্রপতির গোচরেও নিয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা সুবিচার পাননি।

এভাবে নিরীহ ও নির্দোষ লোকেরা দুর্ভোগের শিকার হন এবং তাদের জীবন ধ্বংস হয়ে যায়।

"আর এস এস ছিল পরিবার": নাথুরাম গডসের ছোট ভাই গোপাল গড়্সে

(একটি সাক্ষাৎকার থেকে নেয়া)

● আপনি কি আর এস এস'এর অংশ ছিলেন?

— সব ভাইয়েরাই আর এস এস-এ ছিলাম— নাথুরাম, দত্তাত্রেয়, আমি এবং গোবিন্দ। আপনি বলতে পারেন, আমরা বাড়ির প্রভাব থেকেও বেশি আর এস এস-এর ভেতরেই বড় হয়ে উঠেছি।

● নাথুরাম কি আর এস এসেই থেকে গেছিলেন? তিনি কি তা ছেড়ে দেননি?

— নাথুরাম আর এস এস-এ বৌধিক্কারাভা (বৌদ্ধিক কর্মী) হয়ে উঠেছিল। তিনি বিবৃতিতে বলেছেন যে তিনি আর এস এস ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি এটা বলেছিলেন, কারণ গান্ধী হত্যার পর গোলওয়ালকর ও আর এস এস খুব ঝামেলার মধ্যে ছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি আর এস এস ছাড়েননি।

● আদবানি সম্প্রতি বলেছেন যে আর এস এস নিয়ে নাথুরামের কিছুই করার ছিল না, এটা সত্য কিনা?

— তার বিরোধিতা করে আমি বলছি এরকম বলা কাপুরুষতা। আপনি বলতে পারেন যে 'যাও গান্ধীকে হত্যা কর'— এই বলে আর এস এস কোন প্রস্তাব পাস করেনি। কিন্তু আপনারা তার (নাথুরামের) কৃতকর্মের দায় অস্বীকার করতে পারেন না। হিন্দু মহাসভা তার দায়িত্ব অস্বীকার করেনি। নাথুরাম ১৯৪৪ সালে হিন্দু মহাসভার কাজ শুরু করেন, যখন তিনি আর এস এস-এ বৌধিক্কারাভা ছিলেন।

● গান্ধীকে হত্যা করার পরিকল্পানা কখন তৈরি করা হয়েছিল?

— নাথুরাম হিন্দুরাষ্ট্র নামক এক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, সম্পাদক হিসাবে তার কাছে একটি টেলিপ্রিন্টার ছিল। টেলিপ্রিন্টারে তিনি দেখেন যেপরের দিন গান্ধী অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। (অনশনে দাবি জানানো হবে যে পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা প্রদান স্থগিত রাখা যাবে না। এই দাবি সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ঐ অর্থ প্রদান স্থগিত রাখা হবে। ঐ ৫৫ কোটি টাকা দেশ বিভাগ-পরবর্তী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দেনা-পাওনার হিসাব নিস্পত্তি করার অংশ)। এই দাবি নাথুরামকে অবশ্যই সরাসরি আঘাত করেছিল— এখনই পূর্ণছেদ টানো। সুতরাং ওটা ছিল একটা বাঁক।

কিন্তু আরও অনেক উপলক্ষ ছিল যখন মানুষ গান্ধীকে হত্যা করার কথা ভেবে থাকতে পারে উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে। ঐ লোকটাই আমাদের দুর্দশার জন্য দায়ি, সুতরাং তাকে কেন খুন করা হবে না? এমন অনেক সময়ই ঘটে যে আকাশে মেঘ জমেছে, আমরা ভাবছি ১৫ মিনিটের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে, ভারী বৃষ্টি। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটে না। বাতাস বইতে শুরু করলো, কোন্ দিক থেকে জানি না, সমস্ত মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে গেলো। তাই, ঐ বৃষ্টিপাতের জন্য কি করা প্রয়োজন? সেই বিশেষ বায়ুমণ্ডল, নির্দিষ্ট তাপমাত্রাকে মেঘের জলকণার সঙ্গে সংযোগ সাধন। তখন সেই মেঘে থাকা জলকণা বৃষ্টির ফোঁটার আকারে মাটিতে নেমে আসবে। হয়তো চক্রান্তের পর চক্রান্ত হয়েছিল এবং বাতাস এসে জলকণাসহ মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু যখন সবকিছু ঠিকঠাক ঘটলো, চক্রান্ত ফলপ্রসু হলো। ফলপ্রসু হলো মানে কাজে পরিণত হলো। তাদের লক্ষ্য অর্জিত হলো।

● আপনার সঙ্গে (ভি ডি) সাভারকারের কি সম্পর্ক ছিল?

— কোন প্রশ্ন নেই— আমরা সকলে তাকে আমাদের গুরু - রাজনৈতক গুরু- হিসেবে মানতাম। আমরা তার সমস্ত লেখা পড়েছি। সুতরাং আপনি যদি বলেন আমরা সাভারকারকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছি, আমাদের পক্ষে তাকে জিজ্ঞেস করা বোকামি হবে যে আমরা তা করবো কিনা। এক দুর্বল চিত্তের মানুষের পক্ষেই গুরুর আশীর্বাদের প্রয়োজন। 'আপনারা বোকারা এমন কোনো কাজ করবেন না' একজন তৃতীয় ব্যক্তি নিজে থেকেই কাজটা করলো, আমরা কি বলবো, 'ও আমরাও তাই-ই করতাম, কিন্তু গুরু কি আমাদের হাত বেঁধে দিয়েছেন? " এটা হবে আমাদের নিজেদের ভয়কে বর্ম পড়িয়ে গুরুর বদনাম করা।

● এই হত্যা সম্পর্কে সাভারকারের জবাব কি ছিল?

— সাধারণ নেতাদের মতোই । "এই সংবাদ যখন এখানে আমার কাছে পৌঁছয় আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।" ইত্যাদি আরও কিছু কথা। এটা ছিল তার প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া।

● অনেক লেখকই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু সংস্কৃতিকে এনে আন্দোলনকে ব্যাপকতর রূপ এবং জনপ্রিয় বনিয়াদ দেওয়ার জন্য গান্ধী দায়ী ছিলেন। আপনি কি মনে করেন?

— যদি তাই-ই ঘটে থাকে তবে গান্ধীর পক্ষে আমাদের সরকারকে এই দেশকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণার সাহায্য করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা চাননি। এবং ' হে রাম' বলতে বলতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বলে যে গল্প প্রচলিত হয়েছে তা কংগ্রেসের তৈরি করা। তিনি এধরনের কোন কথাই বলেননি। 'হে রাম' বলে গান্ধীর মৃত্যু হয়েছে বলে যে গল্প আছে তা কংগ্রেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রামের প্রথম ব্যবহার।

কিছু লোক গান্ধীর সম্পর্কে সমালোচনায় বলেছেন যে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা

" মেয়েলি" এবং তিনি হিন্দুধর্মকে অধিকতর সাহসী ও পুরুষোচিত" দৃষ্টিকোন্ থেকে দেখেননি, এই সমালোচনা সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?

— দেখুন, এই কথাটা অনেকটাই দ্ব্যর্থবোধক। যেমন, তিনি রুজভেল্ট, চার্চিল, হিটলার প্রভৃতি সমস্ত যুদ্ধবাজ নেতাদের কাছে যুদ্ধ বন্ধ করার কথা বলেছেন। যখন পন্ডিত নেহরু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, " ঐ জায়গাটা রক্ষার জন্য আমি সৈন্য পাঠাবো কিনা" উত্তরে তিনি বলেন , হ্যাঁ। তিনি চরকাসহ সৈন্য বাহিনী পাঠালেন না কেন? তাহলে একথার অর্থ কি? আপনি কেবল অন্যদেরকেই শেখাবেন— আপনার নীতিতে তো আঁকড়ে থাকেন না।

● যখন উমা ভারতী ও সাধ্বী রিতাম্ভরা বলেন, " আমাদের আরও মারমুখী হতে হবে", হিন্দুরা খুব বেশি দিন যাবত ভীরু ছিলেন, অহিংসা বাস্তবে হিন্দুদেরকে কি দুর্বল করে দিচ্ছে?

— এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত নই। আমার নিজের দেশে আমাকে কখনো মারমুখী হতে বলা যায় না। একটি নির্দিষ্ট ঘটনার কথা বলি— আমার ম্যালেরিয়া হয়েছে। ডাক্তার আমাকে কিছু ইঞ্জেকসন দিলেন। বিদেশ থেকে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ কমানো হয়েছে কিংবা ম্যালেরিয়া নির্মূল করা হয়েছে। আমি কি বলবো যে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে আমাকে মারমুখী বা আক্রমণাত্মক হতে হবে? ম্যালেরিয়ার সম্পর্কে এই আরোপণ নিজেই একটি আক্রমণ। তাই , ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণ করা একটা প্রতিশোধকমূলক ব্যবস্থা হতে পারে। আমার দেশে ম্যালেরিয়া প্রত্যেকটি জীবানুকে আমার শরীর থেকে আমি দূর করতে চাই, এজন্য আমাকে আক্রমণাত্মক বলা যেতে পারে না।

● কোন্ পথে আপনি হিন্দু মহাসভা ও বিজেপি'র ধারাবাহিকতা খুঁজে পান?

— তাদের সকলকেই হিন্দুরাষ্ট্রের পথে আসতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। হিন্দু ও মুসলিমগণকে যখন মিশ্রণ করার চেষ্টা হচ্ছে তখন তারা দুই মেরু প্রান্তের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। পরিস্থিতিটা বসনিয়ার মতো হতে যাচ্ছে।

● একটা গৃহযুদ্ধ কি হতে পারে?

— এটা ঘটতে বাধ্য, আর এই লোকগুলিই এটা ঘটাবে। ভোটের জন্য মুসলিমদের তোষণ ও অনুপ্রবেশ। সোজাসুজি হিন্দু কার্ড খেলার মতো বিজেপি মোটেই যথেষ্ট সাহসী নয়। তাদের সাহস নেই। আপনি যাই করুন, মুসলিম ভোটের ভরসা করতে পারেন না। একবার আপনারা অযোধ্যায় এটা করছেন, তারপর আবার মুসলমানদের কাছে ভোট ভিক্ষা করছেন। এসবে কোন কাজ হবে না।

● সামাজিক সংস্কার ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জড়িত লোকদের সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌পট সম্পর্কে আপনি কি ভাবেন। এদের অনেকে চিৎপবন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় থেকে এসেছেন?

—এই ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়গুলি পেশোয়ারা - বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে উপরের দিক থেকে দেখবেন — সম্পর্কটা পুরোপুরি ব্রাহ্মণ্য। উদাহরণ হিসাবে মঙ্গল পাণ্ডের কথা ধরা যাক, স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম বীর তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। এরপর আপনি যান মহারাষ্ট্রে, বাসুদেব বলওয়ান্ত ফাড়কে, যিনি একটি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ১৮৮৩ সালে এডেনে নির্বাসিত হওয়ার পর তার মৃত্যু হয়েছিল। তারপর চাপেকার ভাইদের কথা আসে, যারা হত্যা করেছিলেন (ওয়াল্টার চার্লস) র‍্যান্ড (১৮৯৭ সালে পুনায় বশ্যতা স্বীকারের পক্ষপাতী, প্লেগ কমিটির চেয়ারম্যান। তারপর আসুন লোকমান্য তিলকের কথায়। তিনিও ছিলেন ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলুঙ্কার, বানাতে .....

- **আপনি কীভাবে তার ব্যাখ্যা করবেন?**

— তারা ছিলেন চিন্তাশীল মানুষ এবং জাতির জন্য কিছু করতে তাদের ছিল আত্মোৎসর্গ করার আবেগপ্রবণতা। সুতরাং যার সততা আছে তিনি তা করেন। দেশ ভাগের ফলে মহারাষ্ট্র সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তা সত্ত্বেও যেসব প্রদেশ বিভক্ত হয়েছে এবং যেখানে যেখানে অত্যাচার নেমে এসেছিল সেসব প্রদেশের জন্য মহারাষ্ট্রের সহানুভূতি ছিল ..... কেন একজন মহারাষ্ট্রবাসীকে ২০০০ মাইল দূরে যেতে হবে? একেই বলে জাতীয় সংহতি। এই ঐতিহ্য সেই অনুভূতির সঙ্গে স্থানান্তরে গেছে। সেই ভারই রয়েছে এর পেছনে। এই কাগজগুলি — আপনি একে হলুদ সাংবাদিকতা বলতে পারেন তারা পেশোয়াই নামই ব্যবহার করে তাদেরকে ব্রাহ্মণ শ্রেণী ও ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্তর্ভুক্ত করে সম্মান হানি ঘটাতে চায়। ওটাই ঐতিহ্য, কারণ তারা তথাকথিত দুর্বল অংশের মানুষকে তোষণ করতে চায়। তারা এদেরকে ভুজন সমাজও বলে থাকেন।

- **আপনি কি ওসব স্বাতন্ত্র্যে কোন বৈধতা দেখতে পান না?**

— আমি আগেই ব্যাখ্যা করে বলেছি যে দেশ বিভাগের সময় কোন ব্যক্তিকেই অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। সকলকেই হত্যা করা হয়েছে। যিনিই মুসলিম ডেগারের লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন তিনিই হিন্দু প্রমাণিত সংজ্ঞা। সুতরাং কারখানায় আমরা একসঙ্গেই আসি। কিন্তু যখন জীবিত থাকি, আমরা বলি, 'না আমি হিন্দু নই। মুসলিমরা সিদ্ধান্ত নেন কে হিন্দু। এমনও ঘটে — এক উপমা দেওয়া যাক — যিনি কোন ঝামেলায় না গিয়ে কিছুটা পৈত্রিক সম্পত্তি পেয়েছেন তিনি অমিতব্যয়ী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন, কোন দুষ্কর্মে রত হয়েছেন, কারণ সম্পত্তির মূল্য কত হতে পারে তা তিনি জানেন না। এসব লোকের কাছে হিন্দু কথাটার অর্থ এমনই দাঁড়িয়েছে।

- **কোন লোকের কথা বলছেন?**

—এই সকল লোক যারা হিন্দুত্বের সমালোচনা করেন। আর এজন্যই তারা এর মূল্য জানেন না।

(ফ্রন্টলাইন, জানুয়ারি, ২৮, ১৯৯৪)

আর এস এস'কে নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে সরকারি ঘোষণা

(সরদার প্যাটেলের পরিচালনাধীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কর্তৃক প্রচারিত)

ফেব্রুয়ারি ৪,১৯৪৮ তারিখে গৃহীত ভারত সরকার তাদের প্রস্তাবে জানায় যে ঘৃণা ও হিংসার যেসব শক্তি দেশে সক্রিয় এবং আমাদের স্বাধীনতাকে বিপদগ্রস্ত করে দেশের সুনাম কালিমালিপ্ত করতে উদ্যত তাদের সমূলে উৎপাটিত করতে সরকার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এই নীতি অনুসারে ভারত সরকার চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে বেআইনি ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গভর্নর শাসিত প্রদেশগুলিতে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

গণতান্ত্রিক সরকার হিসেবে ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি সর্বদাই উদ্বিগ্ন থেকেছে যাতে সমস্ত পার্টি ও সংগঠনসমূহ যুক্তিপূর্ণভাবে তাদের সত্যিকারের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারে, এমন কি সেই রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক নীতিসমূহ যদি সরকারি নীতি থেকে ভিন্ন বা বিরোধীও হয়। তবে যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হলো বিভিন্ন পার্টি ও সংগঠনের কার্যকলাপ যেন সাধারণভাবে স্বীকৃত শোভনতা ও আইনের সীমা লঙ্ঘন না করে যায়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো হিন্দুদের দৈহিক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক হিত সাধন করা এবং তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালোবাসা এবং সেবার মানসিকতার উন্নতিবিধান করা। সরকারগুলি নিজেরাও সমাজের সকল অংশের জনগণের সাধারণ পার্থিব ও বৌদ্ধিক মঙ্গলের জন্য উদগ্রীব এবং এই লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বিশেষভাবে দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সামরিক বিষয়ে শারীরিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও রয়েছে। কিন্তু পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে যে বাস্তব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্গের সদস্যগণ প্রকাশ্যে ঘোষিত তাদের নীতি ও আদর্শের প্রতি অনুগত থাকেনি। সঙ্ঘের সদস্যরা অবাঞ্ছিত এবং এমনকি বিপজ্জনক কার্যকলাপও চালিয়ে গেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদস্যরা দেশের অনেকগুলি অঞ্চলে ব্যক্তিগতভাবে অগ্নি সংযোগসহ হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপ, প্রকাশ্য দিবালোকে লুণ্ঠন ও অপহরণ, ডাকাতি ও খুনে মদত দিয়েছে এবং অবৈধ অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করেছে। সন্ত্রাসবাদী কৌশলের আশ্রয় নিতে , বন্দুকাদি আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করতে, সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে এবং পুলিশ ও মিলিটারির বিরুদ্ধে মিথ্যা

সাক্ষ্য দিতে জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়ে তাদেরকে প্রচারপত্র বিতরণ করতে দেখা গেছে। এসব কার্যকলাপ চালনো হয়েছে গোপনীয়তার আলখাল্লাপড়ে। সরকার সময়ে সময়ে বিবেচনা করে দেখেছে এসব কার্যকলাপের ফলে যৌথ সংস্থা হিসেবে সংঘের মোকাবিলা করতে সরকারের দায় কতটা। গতবার নভেম্বরের শেষ দিকে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীসহ প্রদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকে সরকার তার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে বলে। (NB.বেসরকারি সেনাবাহিনী সম্পর্কে সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব দেখুন। তারিখ—নভেম্বর ১৫, ১৯৪৮)।

তখন সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, সংগঠন হিসেবে সংঘের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এখনো আসেনি, ব্যক্তি হিসেবে যারা অনভিপ্রেত বেআইনি কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে যেমন নেওয়া হচ্ছিল তেমন কঠোর ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হবে। সংঘের আপত্তিজনক ও ক্ষতিকারক কার্যকলাপ অবশ্য আগের মতোই চলতে থাকে, বরং উল্টে তাদের কার্যকলাপের তীব্রতা আরো প্রবল হয়ে উঠতে থাকে এবং সংঘের কার্যকলাপের ফলে অনুপ্রাণিত এবং তাদের দিক থেকে প্রতিশ্রুতি পাওয়ার ফলে হিংসার প্রতি গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস বহু নিরপরাধ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। হিংসায় গভীর ভক্তি ও বিশ্বাসের সম্প্রতিকতম ও অমূল্য বলি হলেন গান্ধীজী নিজে।

এই অবস্থায় সরকারের বাধ্যবাধকতাপূর্ণ কর্তব্য হলো এ ধরনের হিংসার যাতে প্রবলভাবে পুনরাবির্ভাব না ঘটতে পারে সেজন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।এই লক্ষ্য পুরণে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সরকার সংঘকে একটি আইন বিরুদ্ধে সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সরকারের কোন সন্দেহ নেই যে এই পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের সমস্ত আইনের প্রতি অনুগত নাগরিকদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। সমর্থন রয়েছে তাদের সকলেরও যাদের হৃদয়ে আছে দেশের কল্যাণ।

হিন্দু মহাসভা নেতার ঘোষণা — গড্‌সে মন্দির নির্মাণ হবে।
মন্দির , উহাহিঁ বানায়েঙ্গে!